বাংলাদেশের বাজেট ২০০১-২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাকবাজেট ও বাজেটউত্তর বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

বাংলাদেশের বাজেট ২০০১-২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাকবাজেট ও বাজেটউত্তর বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪ ৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bdeconassoc.org
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

বাংলাদেশের বাজেট ২০০১-২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাকবাজেট ও বাজেটউত্তর বিশ্লেষণ

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১২

প্রকাশক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪ ৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bdeconassoc.org
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

কভার ডিজাইন
তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সৈয়দ আসরারুল হক (সোপেন)
শাহিন আহাম্মদ

মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ৮৬১২৮১৯

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

The Publication is Edited by Professor Toufic Ahmad Choudhury, General Secretary, Bangladesh Economic Association. Published by Bangladesh Economic Association, 4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka 1000, Bangladesh. Tel. 9345996, Fax. 880-2-934 5996, Website : www.bdeconassoc.org e-mail. bea.dhaka@gmail.com July 2012. Cover designed by Prof. Toufic Ahmad Choudhury, Syed Asrarul Hoque (Sopen) and Shahin Ahmed. Printed by Agami Printing & Publishing Co.

Price: Taka 200; US$ 50

BEA Executive Committee
2010-2012

President
Abul Barkat

Vice- Presidents
Ashraf Uddin Chowdhury
Hannana Begum
Jamaluddin Ahmed
M. Moazzem Hossain Khan
Syed Yusuf Hossain

General Secretary
Toufic Ahmad Choudhury

Treasurer
Masih Malik Chowdhury

Joint Secretary
A.Z. M. Saleh
Selim Raihan

Assistant Secretary
Monju Ara Begum
Shamima Akhter
Badrul Munir
Mahtab Ali Rashidi
Md. Mozammel Haque

Members
Qazi Kholiquzzaman Ahmad
M.A. Sattar Bhuyan
Md. Zahirul Islam Sikder
Md. Sadiqur Rahman Bhuiyan
Md. Mostafizur Rahman Sarder
Syeda Nazma Parvin Papri
Md. Main Uddin
Mohammad Mamoon
Md. Ali Asraf
Md. Liakat Hossain Moral
Jadab Chandra Saha
Mir Hasan Mohammad Zahid
Md. Tofazzal Hossain Miah
Khourshedul Alam Quadery

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কার্যনির্বাহক কমিটি

২০১০-২০১২

সভাপতি

আবুল বারকাত

সহ-সভাপতি

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

হান্নানা বেগম

জামালউদ্দিন আহমেদ

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক

তৌফিক আহমদ চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ

মসিহ্ মালিক চৌধুরী

যুগ্ম-সম্পাদক

এ. জেড. এম. সালেহ্

সেলিম রায়হান

সহ-সম্পাদক

মনজু আরা বেগম

শামীমা আখতার

বদরুল মুনির

মাহতাব আলী রাশেদী

মোঃ মোজাম্মেল হক

সদস্য

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

এম. এ. সাত্তার ভূঁইয়া

মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার

মোঃ সাদিকুর রহমান ভূইয়া

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি

মোঃ মঈন উদ্দিন

মোহাম্মদ মামুন

মোঃ আলী আশরাফ

মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল

যাদব চন্দ্র সাহা

মীর হাসান মোহাঃ জাহিদ

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

খোরশেদুল আলম কাদেরী

সম্পাদকের নিবেদন

বাজেট একটি দেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক দলিল। বাজেটকে সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রতিফলনও বলা যায়। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি শুধুমাত্র সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনেই সচেষ্ট নয়, সাথে সাথে এদেশের গণমানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যা"ছ। কারণ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। একারণেই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একটি অন্যতম বাৎসরিক কাজ হ"ছ সরকারের নীতি নির্ধারকদের সাথে বাজেট পূর্ব আলোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা এবং বাজেট ঘোষণা পরবর্তী বিশ্লেষণ জনসমে তুলে ধরা। এ কাজটি আমরা গত একযুগেরও অধিক সময় ধরে অত্যন্ত যত্ন সহকারে করে আসছি। ২০১০-১২ সালের কার্যনির্বাহ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাৎসরিক এ কাজটিকে সংকলিত করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা, এর ফলে শুধুমাত্র আমাদের সদস্যরাই গত একযুগ ধরে বাজেট সংক্রান্ত সুপারিশ ও বিশ্লেষণ ধারাবাহিকভাবে পড়ার ও দেখার সুযোগ পাবে তা নয়, যারা সরকারের আর্থিক নীতি সংক্রান্ত গবেষণা করবেন, তাদের জন্যও এটা একটি দরকারী দলিল। গত এক যুগে আমরা বাজেটের বহুমুখী বিবর্তন দেখেছি। কখনও বাজেট ঘোষণা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায়, আবার কখনও হয়েছে স্বল্প বা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কাঠামোর আওতায়। কখনও বাজেট ঘোষণা হয়েছে সংসদে কখনও সংসদের বাইরে। গত একযুগের সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তির ধারাবাহিক কাঠামো কি নির্দেশ করে? রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ধারাবাহিক প্রবণতা কেমন? কাঠামোগত কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা? এ ধরণের প্রশ্নসহ আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আমাদের এই বাজেট সংকলনে। তবে একথা বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশ অর্থনীতি স্থুল সমিতি রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিক নির্দেশনা সামনে রেখে সরকার প্রনীত বাৎসরিক বাজেট দলিল পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করেছে। আশা করি আমাদের এই সংকলনটি সংশ্লিষ্ট সবার জন্য উপযোগী হবে।

সম্পাদক, বাজেট সংকলন ও
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

সূচিপত্র

	সম্পাদকের নিবেদন	iv
১.	"বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনশীল খাত সমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব উন্নয়ন" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত ধারণাপত্র ও আলোচ্য বিষয়াধির উপর প্রতিবেদন	১
২.	বাংলাদেশ সরকারের ২০০২-২০০৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুপারিশমালা	১৩
৩.	বাংলাদেশ সরকারের ২০০২-২০০৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	২৩
৪.	বাংলাদেশ সরকারের ২০০৫-২০০৬ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুপারিশমালা	৩১
৫.	২০০৫-২০০৬ বাজেট ঘোষণা উত্তর সংবাদ সম্মেলন	৪৩
৬.	২০০৬-০৭ বাজেট ঘোষণা উত্তর সংবাদ সম্মেলন বাজেট ২০০৬-০৭: উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই গলদ	৫৭
৭.	বাংলাদেশ সরকারের ২০০৭-২০০৮ অর্থ-বছরের বাজেট উত্তর প্রতিক্রিয়া– সুপারিশ	৭৩
৮.	বাংলাদেশ সরকারের ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ	৯১
৯.	বাংলাদেশ সরকারের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট সুপারিশ	১০৭
১০.	বাংলাদেশ সরকারের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট : প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ	১১৭
১২.	বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুপারিশমালা	১৩৫
১৩.	বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট : প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ	১৪৫
১৪.	বাংলাদেশ সরকারের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ	১৭১

"বাংলাদেশের বাজেটে অনুৎপাদনশীল খাত সমূহের রাজস্ব ব্যয় বনাম মানব উন্নয়ন" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত ধারণাপত্র ও আলোচ্য বিষয়াধির উপর প্রতিবেদন

[গত ২রা জুন, ২০০১ সালে সিরডাপ মিলনায়তনে ডঃ মইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত আমন্ত্রিত বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচকবৃন্দের সহযোগিতায় এ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।]

ডঃ মইনুল ইসলাম, (অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি)

ডঃ মইনুল ইসলাম তার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেন- অনুৎপাদনশীল খাত বাংলাদেশের বাজেটে সিংহভাগ জুড়িয়ে আছে। অনুৎপাদনশীল খাতগুলোর মধ্যে তিনটিই প্রধান, যেমনঃ

১। প্রতিরক্ষা খাতের রাজস্ব ব্যয়;
২। সাধারণ প্রশাসন ; এবং
৩। অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা খাত।

ডঃ মইনুল ইসলাম তার বক্তৃতায় আরো বলেন- "এই তিনটির খাতের যে রাজস্ব ব্যয় এটির সাথে আমরা প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছি মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত খাতগুলোর পেছনে বরাদ্দকৃত রাজস্ব ব্যয়। আমরা সবাই জানি যে, রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি যে উন্নয়ন বাজেট আছে সেটিও ক্রমশঃ আমাদের বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। কিন্তু যেটা আমরা সবাই উপলব্ধি করি সেটা হলো যে, বাংলাদেশের বাজেটে যে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য নির্ভরতা সেটার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে, আমরা আমাদের সরকারের যে রাজস্ব আয় আছে সে

প্রতিবেদন প্রস্তুতে ঃ জনাব মোঃ মুজাফফর আহমেদ, জনাব মোঃ গোলাম মুর্তজা,ড. আখতারী খানম, সদস্য- কার্যকরী কমিটি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, স্থানঃ সিরডাপ মিলনায়তন, তারিখ ঃ ২রা জুন, ২০০১

রাজস্ব আয় থেকে রাজস্ব ব্যয় বাদ দিয়ে যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত, সেটা আমাদের উন্নয়ন বাজেটের অত্যন্ত ছোট একটি অংশ এখনও মিটাতে পারছি। এমন এক সময় ছিল আশির দশকে যখন বলতে গেলে পুরো উন্নয়ন বাজেটটি বৈদেশীক ঋণ এবং সাহায্য নির্ভর ছিল। এমনও ২/১টি বছর গেছে যখন রাজস্ব ব্যয়ের কিছু কিছু ব্যয় বৈদেশীক ঋণ এবং সাহায্যের মাধ্যমে মিটাতে হয়েছে। সেখান থেকে আমরা আজকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। যেখানে উন্নয়ন ব্যয়ের ৫০% এর মত রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকে মিটানো যাে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে, এখনও বেতন-ভাতা খাতে বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি ব্যয়িত হচ্ছে। সেখানে যদি আমরা এই ব্যয়ের রাশ টেনে ধরতে না পারি তাহলে সেখানে উন্নয়নবাজেটে যে সরকারী সঞ্চয়ের পরিমান সেটা তেমন বেশী বাড়ানো যাবেনা। অথচ আমরা জানি যে, বাংলাদেশের একটি শাসনতান্ত্রিক অঙ্গীকার ছিল যে, আমাদের মানব উন্নয়ন রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে এবং যার জন্য শিক্ষাকে বাংলাদেশের সংবিধানে অধিকার হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেহেতু রাষ্ট্রিয় দর্শন হিসাবে মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে গ্রহন করেছি, আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করছি যে, শিক্ষাকে ও বাজারের আর একটি পন্য হিসাবে পরিনত করার একটি তৎপরতা ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে। আমরা এই প্রবণতাকে আত্মঘাতি হিসাবে মনে করছি। এই জন্যে যে, বাংলাদেশের মত দেশে মানব সম্পদ হলো বাংলাদেশের একমাত্র শক্তি, যেটাকে আমরা এইমুহূর্তে গড়ে তুলতে পারছিনা। শিক্ষা নিয়ে রাষ্ট্র এখনও জনগনের সাথে প্রতারণা করছে। যে কারণে আমরা প্রতারণা বলছি- এজন্য যে, এটা শুধু রাজস্বব্যয়ের প্রশ্ন নয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, শিক্ষাকে বৈষম্য, দুর্নীতি, এবং সন্ত্রাসের শিকার করে যতই আমরা রাষ্ট্রিয় নীতি প্রণেতারা গলাবাজি করি যে, আমরা সর্বত্র অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এটা আমার কাছে সত্যিকার ভাবে একটা প্রতারণা বলে মনে হয়। আমরা আজকের এই ধারণা পত্রটি যেটি আমি এবং ডঃ আবুল বারকাত যৌথভাবে রচনা করেছি এখানে আমরা সরকারের প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখবো যে এই প্রতারণার সত্যিকার চিত্র কি রকম এবং এর বিপরীতে আমাদের কি করণীয় সে সম্পর্কে একটা মোটা মাপের দিগ-নির্দেশনা আমরা এখানে দেয়ার চেষ্টা করছি। প্রতিরক্ষা খাত যদিও আমরা জানি যে, একটি ঝবহংরঃরাব বা স্পর্শকাতর বিষয় তবুও আমরা জাতীয় বাজেটে উপস্থাপনা যা আগামী ৭ই জুন পেশ করা হবে তার আগে আমরা এটা জনগনের, আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের এবং নীতিপ্রণেতাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। আমাদের আশা ছিল যে, এই বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকেও তারা সম্পৃক্ত করবেন। আমরা অপেক্ষা করেছি এবং পরে আমরা নিজেরা একটি চিঠি লিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং অর্থসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সাথে আপনারা যোগাযোগ করেছেন কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন

'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি'র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আপনারা একটি বৈঠক করতে পারতেন। সেটার জবাবে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, যেহেতু এবারকার বাজেট নির্বাচনের পূর্বেকার, সেইজন্য ঐ প্রক্রিয়াটি অন্যবারের মত একক অথবা বিচ্ছিন্নভাবে করা হচ্ছে না। এই জবাবটি আমাদেরকে অর্থমন্ত্রীর সচিব মহোদয় দিয়েছেন। আমরা মনে করি যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী একটি নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি এবং কিছু সৎ ও নির্ভিক দিগনিদের্শনা থেকে জাতিকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে এবারকার বাজেট বিশেষতঃ একটি পুরোপুরি আমলাতান্ত্রিক exercise হয়ে গেছে। আমরা জানি এবং যার ফলে আমরা address করছি জনগনকে, সামনে নির্বাচন আসছে জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যদেরকে, যারা এখনও প্রতিরক্ষা অথবা প্রশাসন নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য একটা self-censorship আরোপ করে রেখেছেন। আমরা চাই একটা নির্বাচিত সংসদ যেখানে একদশক ধরে কাজ করছে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে সেখানে এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত হোক। এটাকে যে ঃধনড়ড় অথবা নিষিদ্ধ আইটেমের যে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, সেটা যেন আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিই এই পাকিস্তানী প্রেতাত্মা যেন আমরা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলি এবং এই বিষয়গুলিকে জাতীয় সংসদের সত্যিকারভাবে আলোচনায় পরিণত করি। এই প্রারম্ভিক বক্তব্যের সাথে আমি শুধু এইটুকুই বলবো যে, আজকে আলোচনায় আমরা যাদেরকে আহ্লন করেছি, তারা হয়তো বিব্রত বোধ করতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে যে, এখানে কোন পক্ষ-প্রতিপক্ষ নেই, এটা একটি জাতীয় ইস্যু। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, যেমন প্রশাসনের ব্যক্তি-আমলা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, এটা একটা জাতীয় ইস্যু, যে জাতীয় ইস্যুতে আমরা মনে করি বাংলাদেশের অর্থনীতির যে একটা সম্ভাবনা আছে, সে সম্ভাবনাকে এখনও রুদ্ধ করে রেখেছে এই বিষয়টি এবং বাজেটের অন্যান্য অনেক ইস্যুকে নিয়ে আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমরা জানি যে, ঐ Technicalities- এর চাইতে এখানে যে একটা নীতির প্রশ্ন জড়িত হয়েছে সেটাকে আমরা সামনে নিয়ে এসেছি এবং সেটা রাজস্ব ব্যয়ের, সেখানে কিভাবে আমরা এ অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের লাগামকে টেনে ধরতে পারি এবং সেটা আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়নের মত মানব উন্নয়নের খাতগুলোতে আমরা ব্যয় করতে পারি অথবা সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের খাতে ব্যয় করতে পারি। অতএব, এটার প্রশ্নটা মোটা দাগের হলেও আমরা আশা করবো যে, এটাতে একটা বড় ধরনের নীতিগত পরিবর্তনের ইস্যু যেহেতু জড়িত রয়েছে, এখানে কিছু সাহসী বক্তব্যও লাগবে এবং নির্মূহ দলীয় পক্ষপাতশূন্য কিছু আলোচনাও লাগবে। সেইজন্য আমরা ইস্যুটা এইভাবে নিয়ে এসেছি এবং আপনাদেরকে আমি আহবান জানাব এই আলোচনায় মুক্ত কণ্ঠে অংশগ্রহণ করতে"।

প্রফেসর আবুল বারকাত (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি)

প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর প্রফেসর আবুল বারকাত ধারণাপত্রটি পড়ে শুনান। তিনি বলেন যে, এই ধারণাপত্রের title-টি ছিল "প্রতিরক্ষা অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা প্রশাসন বনাম মানব উন্নয়ন" তবে একটু ভয় পেয়ে title- টি বদলানো হয়েছে কারণ গত কিছুদিন আগে border-এ যে ঘটনাটি ঘটেছে সেজন্য titleটির পরিবর্তন, তবে content-এর কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রফেসর আবুল বারকাত আরো বলেন যে, বাংলাদেশে উত্তোরত্তর সাহায্যের আকাল দেখা যাচ্ছে এবং সেইজন্যই গড্ডালিকা প্রবাহের মত বাংলাদেশ চলছে, ৩০ বছর আগে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তার সাথে আজকের বাংলাদেশের কোন মিল নেই, সেটিই একমাত্র প্রধান কারণ এ বিষয়টিকে নির্বাচন করার জন্য তিনি বলেন যে, ধারনাপত্রটিতে মোট ১৩টি পয়েন্ট আছে। তারপর তিনি ধারণাপত্রটি পড়ে শুনান।

প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে মানব বঞ্চনার বিশাল চৌহদ্দির কয়েকটা নির্দেশক লক্ষণীয়ঃ-

ক) ৫-৬ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে (দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান);

খ) ৪ কোটি বয়স্ক নিরক্ষর;

গ) ২ কোটি শিশু-কিশোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সুযোগ থেকে বঞ্চিত;

ঘ) ৩১ লক্ষ (প্রতি বছর) সদ্যজাতের ৩০ লক্ষ জন্ম কালে ডাক্তারি সেবা সুযোগ বঞ্চিত;

ঙ) ২০ লক্ষ শিশু জন্মগত ভাবে ওজন স্বল্প;

চ) ৮ কোটি মানুষ পয়ঃপ্রণালী সুযোগ বঞ্চিত;

ছ) ৭ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সুযোগ বঞ্চিত;

জ) ১.৫ কোটি শিশু (পাঁচ বছরের কম বয়সী) অপুষ্টির শিকার;

ঝ) ২ মিলিয়ন শিশু জন্মের ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে;

ঞ) প্রতি বছর যে ৬ লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করেন তাদের প্রায় অর্ধেকই শিশু (৭ বছর বয়স পর্যন্ত) এবং তাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ দারিদ্র-উদ্ভূত সংক্রামক ব্যাধি; এবং

ট) প্রতিবছর যে ৬ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন তাদের অর্ধেকই মারা যান অতি সাধারণ ৪টি কারণে শ্বাসতন্ত্রের অসুখ (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া, হাম ও যক্ষা (এখানে যক্ষা নিরাময়ে খরচ হয় ৯০০/- টাকা, নিউমোনিয়ায় ১৩ টাকা, ডায়রিয়ায় ১৭ টাকা, হামে ১২ টাকা) যক্ষা রোগির সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর চতুর্থ শীর্ষে।

ডঃ মোঃ মাসুম, (অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ মাসুম বলেন যে, গোলটেবিলের এই আলোচ্য বিষয় ও উপস্থাপনার বিষয়টি অত্যন্ত সাহসী এবং বিশ্লেষণ ধর্মী এবং সময়োপযোগী। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে তবে বিশেষভাবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই বিষয়টি choose করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি অনুৎপাদনশীল যে তিনটি খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার সাথে সম্পূর্ন একমত পোষণ করেন নাই। প্রতি রক্ষা ও সিভিলকে তিনি উৎপাদনশীলতার ভূমিকায় তুলে ধরেন। ডঃ মাসুম এই দুইটি খাতের কতটুকু উৎপাদনশীল এবং কতটুকু অনুৎপাদনশীল তার একটি বিশ্লেষনের ব্যাপারে তার মতামত দেন। ঢালাওভাবে, তিনি এগুলোকে অনুৎপাদনশীল বলা ঠিক নয় বলে মনে করেন। তিনি অবশ্য বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের গেষ্ট হাউসগুলোতে উপরের লেভেল এর অফিসারদের যে ধরনের বিলাসবহুল জীবন যাপন করে (সাধারন সৈনিকদের তুলনায়) সে ব্যাপারে তিনি একমত। সামরিক বাহিনীর পিছনে যে ব্যয় বরাদ্দ হয় সেটা কিভাবে "To what extent that is serving the elite Class within the army" সেটা একটু বিবেচনায় আনা দরকার। তিনি সাধারন সৈনিকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো জন্য জোর দেন। ডঃ মাসুম ঢালাওভাবে সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল না বলার পক্ষে কিছু যুক্তি প্রদর্শন ও উদাহরণ দেন। উপস্থাপনার প্রায় সব বিছুর সঙ্গে তিনি একমত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, NATO'র ক্ষেত্রে যে ২৫% প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে আমাদের দেশে সেটা হয়নি, যদিও আমাদের Chittagong Hill Tracts CHT তে Peace Teaty হয়েছে।

উইং কমান্ডার এম. হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতিক (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার বি.এন.পি'র নির্বাচিত সংসদ সদস্য)

উইং কমান্ডার এম, হামিদুল্লাহ খান বলেন যে, উপস্থাপনা খুব ভাল লেগেছে, কারণ এর আগে আর কেউ এভাবে খোলাখুলি, সত্যিকথা, সাহসিকতার সাথে বলেছে বা বলার চেষ্টা করেছে কিনা জানা নেই।

তিনি বাংলাদেশের বাজেট সর্ম্পকে বলতে গিয়ে একবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশপোর্ট ইমিগ্রেশনের ১৩ কোটি টাকার বাজেটে ৭০ কোটি টাকা সম্পুরক বাজেটের কথা উল্লেখ করেন। এখানে জনগনের কাছ থেকে collect করে বাজেট তৈরী করা হয়। অর্থ্যাৎ জনগনের কাছ থেকে collect কর, but give nothing. জনাব হামিদুল্লাহ খান সাহেব বড়াই বাড়ী'র incident সম্পর্কে বলতে গিয়ে "Peoples Participation" এর উপর জোর দেন। বাজেট সম্পর্কে আরো বলেন যে, পুরো বাজেটাই একটি ভন্ডুল এবং এটি একটি garbage তিনি সরকারী আমলাদের অপচয় এর কথা বলেন। Peoples army 'র উপর জোর দেন। শেখ আহমেদ ইয়াহিন

হাসান এর হেড বলেছিলেন যে, Resistance is the only correct option to reach the goals. We are asking not to any body but to the People of this world to give resistance a chance to prove its validity" আমরা যদি কিছু করতে চাই, "We have to resist, resist and resistance will give everything, Otherwise, আপনাদের সাথে আমরা বসে কথাবার্তা বলা, nothing will achieve" এই বলে তিনি তার বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন।

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, (পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র)

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন যে, গোলটেবিলের আলোচ্য বিষয় এত ভাল যে, বলার বেশী কিছু নাই, কিছুটা বিশ্লেষণ হতে পারে, কিছুটা যোগ হতে পারে। তিনি বলেন যে, "মিগ ফ্রিগেট কিনার পরে বাংলাদেশ আক্রান্ত হয়েছিল সেটা উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান সাহেব বললেন।"

ডাঃ জাফরুল্লাহ বলেন যে, আমাদের প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন আমাদের কে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা দিতে পারেনি। তিনি Internet এ বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈদেশিক দূতাবাসের তথ্যের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আমাদের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা যে সেটিই হয়নি তার প্রমান স্বরূপ "Major roads between towns can be subject to night time bandity. Passenger trains, long distance buses and ferry's, often been targeted by organized ganges of thiefs," "There have been report of police abusing their authority" এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার একটি হিসাব। ডাঃ জাফরুল্লাহ আরো বলেন যে, "যত দিন পর্যন্ত Transparency না আসবে, যে কথাটা আপনারা অত্যন্ত জোর দিয়েছেন, আমরা জনগণ কিছুই জানতে পারবনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না।" অনেক সময় উৎপাদনশীল খাতও অনুৎপাদনশীল খাত হয়ে যায়। যেমন, বিচার বিভাগ অত্যন্ত উৎপাদনশীল খাত, কিন্তু দীর্ঘ সূত্রিতা অনেক সময় এটাকে অনুৎপাদনশীল করে। তিনি বলেন যে, অনুৎপাদনশীল খাতকে কিভাবে উৎপাদনশীল খাতে পরিণত করা যায় তা দেখা দরকার। তিনি আরও বললেন যে, ছাত্রদেরকে বাধ্যতামল্লক সামরিক প্রশাসন দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা উচিৎ, তিনি উল্লেখ করেন যে, সামরিক বাহিনীকে তাদের Purchase এর জন্য কোন tax দিতে হয় না, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি এর Purchase এর জন্য tax দিতে হয়, এমন কি খাদ্য আমদানীর উপরও tax দিতে হয়। তিনি সরকারকে বিকেন্দ্রীক করার প্রস্তাব দিলেন এবং বললেন যে, জনপ্রতিনিধি সরকার থাকলে এবং জবাবদিহিতা থাকলে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ এবং bureaucrat দের অপব্যয় রোধ করা যেত। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের অবহেলার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন যে, এসব দূর করা যাবে যদি শিক্ষাকে বিকেন্দ্রীক করা হয়।

ডঃ মইনুল ইসলাম

এ প্রেক্ষিতে কমেন্টস্ হিসেবে তিনি বলেন যে, আমরা সামরিকখাতে, শিক্ষার খাতে কত ব্যয় করব তার একটা জাতিগত মতামত থাকা উচিৎ।

জনাব সালাহউদ্দীন আহমেদ (প্রাক্তন সচিব এবং ডি.জি স্বনির্ভর)

জনাব সালাহ্উদ্দীন বলেন যে, আমরা যদি সম্পূর্ন বাজেট প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করি তবুও কোনদিন ভারতের বা চীনের সাথে পারব না। কাজেই, M.I.G কেনা, ভৎরমধঃব কেনা সম্পূর্ন অনুৎপাদনশীল। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। জাপানে যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাদের internal defense force তাদের দেশটাকে উচ্চশিক্ষার দিকে নিয়ে গিয়েছে সেরকম আমাদের না করতে পারার কারণ হল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়। তিনি ডঃ মাসুম এর বক্তব্য যে আভ্যন্তরীন প্রশাসন এর সব খরচ অনুৎপাদনশীল, এরকম নষধহশবঃ মন্তব্যর প্রতিবাদ করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ে যানবাহন খাতে প্রচুর অপব্যয় হয়। এগুলো হ্রাস করতে পারলে দারিদ্র সীমার উন্নতি এবং micro credit খাতে ব্যয় বাড়ানো যায়। তিনি মন্তব্য করেন যে যদিও বাংলাদেশের microcredit বিতরণকারী NGO গুলো বেশ সুনাম অর্জন করেছে এসব সরপৎড় পৎবফরঃ কর্মসূচী দারিদ্র জনগোষ্ঠী সিকে ভাগও পৌছতে পারেনি। তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমানে আত্নসামাজিক উন্নয়ন এবং শিল্প উন্নয়ন যে গতিশীল হয়নি তার একটি প্রধান কারণ হল ইন্টারনাল সিকিউরিটি অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীতে শিক্ষিত ও inspired জনশক্তি যোগদান করে নাই। কাজেই দুর্বল internal security force থাকার কারণে মাস্তানি ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্শ্ববতী দেশসমুহ যথা ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকায় যেখানে প্রতি ৬০০ বা ৭০০ জনের জন্য একটি পুলিশ রয়েছে সেখানে বাংলাদেশের প্রতি ১৪০০ জনের জন্য একটি পুলিশ আছে। তাছাড়া, সন্নাসীদের তুলনায় পুলিশের অসু খুবই নিম্মানের। কাজেই পুলিশবাহিনীর জন্য ব্যয় একটি অনুৎপাদনশীল ব্যয় একথা ঠিক না।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কমিনিস্ট পার্টি)

প্রথমেই তিনি ইউঅ কে একটি সুলিখিত, সুচিন্তিত এবং সাহসী বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এবং কমিউনিস্ট পার্টি এর ও বামপন্থী আন্দোলন এর পক্ষ থেকে প্রায় সবগুলো বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলেন এবং আশা করলেন যে এই বিষয় নিয়ে শুধু সেমিনার নয়, সত্যিকারের একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠুক। তিনি তার বক্তৃতায় কয়েকটা পয়েন্ট তুলে ধরলেনঃ

১। এই সরকার খুব শীঘ্রই কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছে। তাহলে একটা বছরের পূর্বে বাজেট এরা পেশ করবে নাকি পরবর্তী সরকার নিধার্রণ করবে: কোনটা ঠিক?

২। সেমিনারে রাজনীতি এর অর্থনীতিকে ভিন্নভাবে দেখা হয়েছে। রাষ্ট্রর ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র Should be facilitator and regulator- এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু Why not direct participation in economic activities? আবার theory তে আন্তর্জাতিক ভাবে বলা হয় যে "Government has no business to do business." কিন্তু যেসব দেশ এসব কথা বলে তাদের রাষ্ট্রদূতরা কিভাবে নিজেদের জন্য business করছে তা দেশবাসীর অজানা নয়। তারা national budget এর size ছোট করে নিয়ে আসতে বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দেশের budget এর ব্যয় উৎপাদনশীল খাত থেকে অনুৎপাদনশীল shift খাতে করছে।

৩। আমাদের সামনে একটা pseudo বির্তক দাড় করানো হয়েছে -public sector ebvg private sector । কিন্তু মল্ল বিতর্ক এটা নয়। বিতর্ক হল productive sector ebvg unproductive sector. সেটা public sector -এ আছে, private sector -এও আছে। আমরা যদি a grand alliance of productive sectors-এর বিরুদ্ধে a grand alliance of non productive sectors দাঁড় করাতে পারি তাহলে এ সমস্যার সমাধানের ভিত্তি হতে পারে।

৪। বাংলাদেশে private sector এর মধ্যে সবচেয়ে productive sector nj agriculture, কিন্তু কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম থেকে অনেক কম পায়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এমনকি আন্তর্জাতিক ভাবে একটা vested interest জড়িত হয়ে অনুৎপাদনশীল ধারার দিকে expenditure নিয়ে যাচ্ছে। এই globalization nj imperialist globalization- multi-national এর পক্ষে globalization- যার পরিণতি recolonization আমাদের কে foreign aid দেয়া হচ্ছে তাদের ইচ্ছানুযায়ী, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী না।

ফাতেমা জোহরা, (বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ)

তিনি বলেন, বাংলাদেশে যতগুলো বাজেট হয়েছে তার মধ্যে কোন বাজেটেই শিশু উন্নয়ন বা মায়ের উন্নয়ন এর জন্য কোন বরাদ্দ হয়নি।

প্রেসিডেন্ট ঃ BEA

এই প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট BEA স্বীকার করলেন যে, আলোচনাটা এক তরফা হয়ে গিয়েছে এবং এই পর্যন্ত মানব সম্পদ উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে তেমন

আলোচনা হয় নাই। তবে তিনি মত প্রকাশ করলেন যে, উন্নয়ন বাজেটের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া বদলানো না হয় ততক্ষণ বাজেট এরকমই থাকবে।

ডঃ আতিউর রহমান, (চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক)

ডঃ আতিউর প্রশ্ন করলেন যে, বর্তমান বিশ্বে যে চ্যালেঞ্চ আমরা সম্মুখীন হচ্ছি সেরকম শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা প্রযুক্তি আমরা কেউ অর্জন করতে পেরেছি? উদারহণ দিতে গিয়ে তিনি জানালেন যে, ভারতে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে একশ কোটি ডলার (US dollar one billion) ব্যয় করা হবে যাতে একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য জ্ঞানকর্মী তৈরী হয়ে উঠে। তিনি হতশার সুরে মন্তব্য করলেন যে আমাদের পুরোনো বিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না এবং বললেন যে, আমাদেরকে আগের দিকে এগুতে হবে এবং তার জন্য expenditure এর কি কি অগ্রাধিকার হবে তা ঠিক করতে হবে। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা দারিদ্র কিন্তু শুধু দারিদ্র খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দারিদ্র বিমোচন করা যাবে না। দ্রারিদ্র বিমোচন এর জন্য যে সুশাসন দরকার সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। জনাব আতিউর স্পষ্টভাবে বক্তব্য রাখলেন যে, বাজেট শুধুমাত্র কিছু অংকের মারপ্যাচ নয়। বরং প্রত্যেকটি বাজেট চলমান উন্নয়ন কৌশলের প্রতিফলন। একপর্যায়ে তিনি মতপ্রকাশ করলেন যে, নাগরিক সমাজকে বাজেট আলোচনায় যদি আনা হয় তাহলে তার একটা প্রভাব আছে এবং সেকারনেই বাজেটে কিছু পরিবর্তন আনা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন যে, যারা মানব সূচকে সবচেয়ে নীচে তাদের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ থাকা উচিৎ। বর্তমান বিশ্বায়ন এর কথা তিনি উল্লেখ করে বলেন যে, আমরা আজকে একটা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরে গিয়েছি। সে প্রক্রিয়াতে আমাদের অংশ গ্রহন কতটা হবে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বিশ্ব মার্কেটে অংশগ্রহন বাড়াতে হবে। সেই বিশ্ব মার্কেটে প্রবেশ করতে হলে আমাদের tecnological capacity বাড়াতে হবে। সেজন্য আমাদের technology policy থাকা দরকার। শুধু মাত্র শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ালে চলবে না। আমাদের quality of human capital উন্নত করতে হবে।

কৃষির খাতে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কৃষিতে ভালো করার ফলে কৃষকের demand বেড়েছে কিন্তু আমরা non farm activities কে Urban এবং rural এর মধ্যে একটা linkage করতে পারছি কিনা সেটা দেখতে হবে এবং বাজেটে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকা উচিৎ। যাতে এর মাধ্যমে গরীব কৃষকরা urbanization এর সুবিধা পায়। তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন যে, আজকের এই বিশ্বায়ন এর বাস্তবতায় শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। এই জন্য আমাদের কি ধরনের শিল্পায়ন হবে সেজন্য বাজেটে সুযোগ সুবিধা থাকা উচিৎ। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতে গত বাজেটে তাদের রপ্তানি শিল্পের backward linkage এর উন্নয়ন এর

জন্য ৩০ হাজার কোটি রূপী বরাদ্দ রেখেছে। আমরা এ জাতীয় বরাদ্দ বাজেটে রাখতে পারলে সেটা সবচেয়ে উৎপাদনশীল expenditure হত। পরিশেষে তিনি বললেন যে, যেহেতু আমাদের জনশক্তি অর্ধেক নারী, আমরা যদি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে পারি তাহলে আমাদের productive capacity বেড়ে যাবে।

জনাব আবদুল খালেক, (প্রাক্তন আই জি)

জনাব আব্দুল খালেক বলেন যে, ১০ বছর আগেও মানব উন্নয়ন এর কথা শোনা যায় নি, কিন্তু এখন তা শোনা যাচ্ছে এবং আলোচিত হচ্ছে এবং এর সাথে উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বনাম অনুৎপাদনশীল খাতও আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় সম্পর্কে চেতনা গড়ে তোলার জন্য তিনি BEA কে ধন্যবাদ জানান।

তিনি মত প্রকাশ করেন যে, আমাদের মত দেশের জন্য উন্নত দেশগুলোর সাথে টিকে থাকা একটি অসম্ভব ব্যাপার। আগামী দিনের একটি চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন যে, দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যয় এর কারনে আগামী ২০/২৫ বছরে আমাদের মানব উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতার নামতে পারব না।

র‍্যাপোটিয়র, ডঃ আখতারী খানম

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে জনাব খালেক বলেন যে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, বিডিআর, আনসার, ভিডিপি এতগুলো বাহিনী অপ্রয়োজনীয়। এগুলোর পিছনে অতিরিক্ত বরাদ্দ হচ্ছে। তাঁর মতে গ্রামে গঞ্জে সুধী সমাবেশে Acceptable suggestion নিয়ে ক্রোড়পত্র তৈরী করার প্রয়োজন।

প্রফেসর আবুল কাসেম, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বাজেটকে উপর থেকে চাপানো বাজেট হিসেবে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের Geo-political অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি আমলাতন্তের অশুভ হস্তক্ষেপ বন্ধ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

ডঃ এনামুল হক, (প্রাক্তন আই জি)

তিনি শিশু এবং বয়স্কদের স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহনের কথা উল্লেখ করেন। বাজেট ব্যয় সম্পর্কে তিনি invisible খাতে ব্যয় হ্রাসের পক্ষে মতামত রাখেন।

ডঃ শফিকুজ্জামান, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি সামরিক ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল আখ্যায়িত করেন এবং ব্যয় হ্রাসের পক্ষে মত রাখেন। কৃষিতে ব্যয় বৃদ্ধি লাভজনক বলে তাঁর ধারনা।

জনাব আব্দুর রব ভুঁইয়া

প্রাথমিক শিক্ষা এবং Health sector কে গুরুত্ব দেবার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক আনু আহমেদ

অনুৎপাদনশীল খাতগুলোকে চিহ্নিত করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সামরিক খাত অনুৎপাদনশীল খাতের একটি খন্ড চিত্র মাত্র। তাঁর মতে বাজেট একটি অন্যতম প্রতারনা মল্লক দলিল মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন দারিদ্র বিমোচনে বরাদ্দকৃত অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যয়িত হচ্ছে, ধনীদের পূর্নবাসনে।

ডাঃ শরাফুদ্দীন আহমেদ

তিনি বলেন বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ গত তিরিশ বছরে একই রকম রয়েছে।

ডঃ জিয়াউল হক, (Sultan Qabooa University, Oman)

Transfer of resource এর উপর গুরুত্ব দেন এবং কিভাবে এটি সম্ভব সে ব্যপারে প্রশ্ন রাখেন।

এম এ সাত্তার ভুঁইয়া, (পরিকল্পনা কমিশন)

BEA Ombudsman হিসাবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন।

জনাব আব্দুল মতিন, (ভাষা সৈনিক)

তিনি বর্তমান সমাজের ভয়াবহ চিত্র উল্লেখ করেন এর পরিবর্তন আনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, (আইবিএ)

তিনি resource reallocation এর পূর্বে বিভিন্ন সেক্টরের marginal social cost এবং marginal social benefit সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা থাকা প্রয়োজন বলে মত রাখেন।

সভাপতির ভাষণ

তিনি সরকারের জবাবদিহিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সরকারকে due role play করতে দিতে হবে এবং সে ভূমিকা শুধু marginal change এর জন্য নয় বরং character change এর জন্য হতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের ২০০২-২০০৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুপারিশমালা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. মইনুল ইসলাম *
ড. আবুল বারকাত **

[১৮মে, ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রতিনিধিদের বাজেট সম্পর্কিত মত বিনিময় সভায় উপস্থাপিত]

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সংবিধানে 'সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার মূল নীতির মাধ্যমে একটা সমতাভিমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এখনো বহাল রয়েছে। তাই যাবতীয় সরকারী কর্মকান্ডে বৈষম্য নিরসনের কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে এবং দারিদ্র সৃষ্টির সকল উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে, জনগণের কাছে সরকারী সেবা প্রকৃত বিচারে সরকারী নির্যাতনে পর্যবসিত হয়েছে। উৎকোচ ব্যতিরেকে কোন সরকারী সেবাই মিলছে না। পুরো সমাজ সন্ত্রাসী ও অপরাধী উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুবৃত্তায়ন ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সাধারণ জনগণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। এমনি একটি সংকটজনক প্রেক্ষাপটে আজকের এই মত বিনিময় সভা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সাড়ে তেরো কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন দর্শনই হওয়া উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় দর্শন।

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

কারণ, উন্নয়ন হল স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবেঃ

১) অর্থনৈতিক সুযোগ;
২) সামাজিক সুবিধাদি;
৩) রাজনৈতিক স্বাধীনতা;
৪) স্বচ্ছতার গ্যারান্টি; ও
৫) সুরক্ষার নিশ্চয়তা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতে, বাংলাদেশের সরকারী বাজেটের অগ্রাধিকার নির্ধারণে আজো প্রকৃত বিচারে মানব উন্নয়নকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব প্রদানের এই দর্শন প্রতিফলিত হয়নি। কারণ, বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাধারণ প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতের মত অনুৎপাদনশীল কার্যক্রমে সরকারের ব্যয় আজো অগ্রহণযোগ্যভাবে বেশি রয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা খাতের 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণ 'অদৃশ্যমান' ও 'টপ সিক্রেট' উন্নয়ন ব্যয় হয়ে থাকে তা যেহেতু আমাদের জানার উপায় নেই তাই আমাদের পক্ষে প্রতিরক্ষা খাতে মোট সরকারী ব্যয় শুধু অনুমানই করা সম্ভব। এমনকি, সরকারী বাজেটের শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, গণপূর্ত খাত, খাদ্য বাজেট, ঋণ পরিশোধ খাত, 'অন্যান্য' - ইত্যকার নানান খাতে ছড়িয়ে রাখা হয় প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সাথে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের সরকারী ব্যয়। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের তথ্যও 'টপ-সিক্রেট'। এহেন সুস্পষ্ট তথ্যহীনতার মধ্যেও সাধারণভাবে বলা চলে, ১৯৭২ সালকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করলে ২০০২ সালে এসে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আয়তন ন্যূনপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার, সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যেও স্থল বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধির তুলনামূলক হার নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর আয়তন ও মান বৃদ্ধির হারের চাইতে অস্বাভাবিক রকমের বেশি। দেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা এবং আয়তন বৃদ্ধি থেকেও তা বোঝা যায়। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতে, বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের পেছনে সরকারী ব্যয়ের এই স্ফীতি মানব উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্খিত অগ্রগতিকে অব্যাহতভাবে বিঘ্নিত করে চলেছে। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ইস্যুটিকে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে চাই যে, প্রতিরক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের সাথে মানব উন্নয়ন ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ঘোষণা করছে, বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বৃদ্ধি আর করা হবে না মর্মে সরকারী ঘোষণার সময় এসেছে, এবং ধাপে ধাপে প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত সরকারী ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষতঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির, সহায়তায় এ-দুটো খাতে সরকারী ব্যয় অতি দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশে প্রবল প্রতাপে অক্ষুন্ন রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াসকে রুখে দাঁড়াতে হবে শুধু সরকারী রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে নয়, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথের বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যে। সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কালো পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে উৎপাদনশীল সকল খাত থেকে। দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছেন। রাষ্ট্রের কারণে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জনগণের উন্নয়ন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা সমূহ বর্তমানে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের লালনক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়ে রসাতলে যেতে বসেছে। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠির ধারক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্যোগের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে একুশ শতকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখানো জনগণের সাথে সরকারের নিষ্ঠুর প্রতারণার শামিল। আরো দুঃখজনক হলো, সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্ত বাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করার প্রয়াসে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করার হুজুগে মেতে উঠেছে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্যকে সমাজ জীবনে আরো দৃঢ়মূল করার আত্মঘাতী পথে অগ্রসর হয়েছে। এহেন বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে দারিদ্র সৃষ্টির কারখানা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এটাকেও উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার সর্বনাশা প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হয়েছে রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা সহায়তায়। সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুঠছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকের আশ্রয় নিচ্ছেন। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচারণ ও মারাত্মকভাবে অপ্রতুল এবং জরাজীর্ণ স্বাস্থ্য সরঞ্জামের প্রতীক হয়ে দিনদিন রসাতলে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের শামিল।

বাজেট সম্পর্কে সুপারিশমালা

উপর্যুক্ত মুখবন্ধের আলোকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ঘোষণা করছে, বাংলাদেশের সরকারী বাজেটের "কাঠামোগত রূপান্তর" অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে সরকারী বাজেটের রাজস্ব ব্যয়, রাজস্ব আয়, সরকারী ভর্তুকি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন নীতির বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ সরকারের সক্রিয় বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

সরকারী ব্যয়

প্রতিরক্ষা

১। ক) প্রতিরক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস কার্যকর করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ টাকার অংকে গত অর্থ বছরের স্তরে স্থির রাখা হোক।

খ) পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা ও বির্তকের ব্যবস্থা করে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা হোক। সংসদের প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করা হোক।

গ) শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'রিজার্ভ আমর্ড ফোর্সেস' গড়ে তোলার প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপন করা হোক, যাতে স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রয়োজনে ঐ রিজার্ভ বাহিনীকে তলব করে যে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধকে সার্বজনীনতা প্রদান করা যায়।

ঘ) অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থলে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের স্তরে সংখ্যা-হ্রাস নীতি ধাপে ধাপে কার্যকর করে বছর দশেকের মধ্যে স্থায়ী বাহিনীসমূহের আকার-আয়তন উল্লেখযোগ্য ভাবে (অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ) কমিয়ে আনা হোক।

ঙ) প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত সরকারী ভর্তুকি ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধেগুলোকে পর্যায়ক্রমে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা

হোক। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খাদ্য-ভর্তুকিকে যৌক্তিক স্তরে অবনমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। (বাংলাদেশের কৃষক ভর্তুকি পাবার যোগ্য বিবেচিত না হলে সমাজের আর কারো সরকারী ভর্তুকি পাবার অধিকার থাকা যৌক্তিক নয়!)

সাধারণ প্রশাসন

২। সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ

ক) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের জনকল্যাণমুখী প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের আন্তরিক প্রয়াস নিয়ে প্রশাসনের আকার-আয়তন ছেঁটে ফেলা হোক।

খ) কারণিক পর্যায়ের কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রশাসনে দ্রুত কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হোক এবং সকল কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে Crash Programme নিয়ে প্রয়োজনীয় কমপিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হোক।

গ) মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ব্যুরোর সংখ্যা হ্রাস সম্পর্কিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হোক।

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়ন করা হোক।

ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক স্তর বিলুপ্ত করা হোক। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

চ) ঢাকাসহ দেশের সকল সিটি করপোরেশনে 'সিটি গভর্নমেন্ট' গঠন করা হোক। রাজউক, চ.উ.ক, খু.উ: ক: এর মত আলাদা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে সিটি গভর্নমেন্টের আওতাধীনে নিয়ে আসা হোক।

ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ওগুলোর রাজস্ব আহরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কর/ফিস্ আহরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হোক।

জ) সরকারী হুকুম দখলের মাধ্যমে আবাসিক এলাকা নির্মাণ এবং আবাসিক প্লট বিতরণ বন্ধ করা হোক।

শিক্ষা

৩। শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং মানের অবক্ষয় রোধ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ ঃ

ক) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একীভূত করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

খ) ক্যাডেট কলেজ ও পাবলিক স্কুল পরিচালনায় প্রদত্ত সরকারী ভর্তুকি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হোক। পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষা ধারাকে মূল ধারার সাথে একীভূত করা হোক।

গ) নোট বই মুদ্রণ, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হোক এবং শাস্তির বিধান চালু করা হোক।

ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য ক্যাম্পাসে দেশের মূল রাজনৈতিক দলসমূহের দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

ঙ) যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সুবিধে সম্প্রসারিত হয়েছে, সেখানে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার ল্যাব স্থাপন করে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে কমপিউটার সম্পর্কিত কোর্স গ্রহণে বাধ্য করা হোক। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলায় অন্তত: একটি স্কুল এবং একটি কলেজে কমপিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হোক।

চ) প্রাইভেট সেক্টরের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে Non-Profit প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক।

ছ) কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষিদ্ধ করা হোক।

সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা

৪। চোরাচালান সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে 'Selective Liberalisation, Selective Control' নীতির অধীনে পদক্ষেপসমূহ ঃ

ক) যেহেতু মার্চ মাসে ভারতীয় বাজেট ঘোষিত হয়, তাই ভারতের শুল্ক ও কর ব্যবস্থাকে আইটেম ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে যেসব আইটেম

চোরাচালানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সেগুলোর উপর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শুল্ক এবং কর হ্রাস/বৃদ্ধি করে দামের পার্থক্য নিরসন করা হলে চোরাচালান কমে আসবে। এ উদ্দেশ্যে ট্যারিফ কমিশন এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট Cell গঠনের ব্যবস্থা করা হোক।

খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গবাদিপশুর চলাচল সম্পূর্ণ অবাধ করে দেয়া হোক, এবং এ সম্পর্কিত ৫০০ টাকা/ ১০০০ টাকা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা রহিত করা হোক।

গ) নিত্য প্রয়োজনীয় মশলাপাতি, ফলমূল, ডাল বা খাদ্য দ্রব্য ড় যেগুলোতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে কিংবা যেগুলো এদেশে উৎপাদিত হয়না সেগুলোর আমদানি শুল্কমুক্ত করে দেয়া হোক।

ঘ) বাংলাদেশের আমদানীকৃত পণ্য ভারতে পাচার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে ঐ আইটেমগুলো চিহ্নিত করে ওগুলোর আমদানী শুল্ক rationalise করা হোক।

৫। দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যে সকল ধরনের জেনারেটরে গ্যাস সংযোগ প্রদানে বিদ্যমান বাধা-নিষেধ রহিত করা হোক। এমন কি, ৫/১০/২০ কিলোওয়াটের জেনারেটরেও গ্যাস সংযোগ প্রদানকে উৎসাহিত করা হোক।

৬। সৌরশক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেল এবং ফটো-ভলটায়িক ব্যাটারির কাঁচামাল আমদানি শুল্কমুক্ত করা হোক।

৭। গ্যাসের সিলিন্ডার উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিলিন্ডার উৎপাদনের কাঁচামাল ও মেশিনারী আমদানি শুল্কমুক্ত করা হোক। এল পি জি'র পাশাপাশি এল এন জি সিলিন্ডার গ্যাস উৎপাদনকে উৎসাহিত করে সাধারণ জনগণের কাছে দেশের গ্যাস সম্পদ পৌঁছে দেয়া হোক।

উন্নয়ন নীতি

মানব বঞ্চনা ও দারিদ্র

৮। বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কিভাবে এবং কোন্ সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র দূরীকরণসহ সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিক্ নির্দেশনা থাকতে হবে।

৯। দারিদ্র নিরসন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিদ্যুৎ সুবিধা

১০। যে ১১ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ-সুবিধে বঞ্চিত তাদেরকে কিভাবে ও কোন্ সময়ের মধ্যে (পর্যায়ক্রমে) বিদ্যুৎ সুবিধে নিশ্চিত করা হবে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

নারী-উদ্দিষ্ট কর্মকান্ড

১১। নারী-উদ্দিষ্ট (gender sensitive) প্রকল্পসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং উন্নয়ন বাজেটে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য হ'ল মহিলাদের কর্মসংস্থান, কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন (গার্মেন্টসসহ), মহিলাদের পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রায়ন, বিধবা ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, শিক্ষকদের ৬০% মহিলা, মহিলাদের নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধে, ডে কেয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা, ইত্যাদি।

পরিবেশ

১২। সিএনজি কনভারশনের অবকাঠামো দ্রুত ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

১৩। পরিবেশ দূষণকারীদের জন্য বিশেষ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

১৪। পরিবেশ দূষণকারী শিল্প কারখানা (যেমন ট্যানারি) লোকালয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তার আগে কেন্দ্রীয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৫। নদ-নদীসহ বিভিন্ন জলাশয় অবৈধ দখল মুক্ত করতে হবে।

ব্যাংক ঋণ

১৬। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্তত ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পুঁজি সম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হোক, এবং প্রতিটি ব্যাংকে Small Enterprises Cell গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। Movable Assets এর ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং সিস্টেমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক।

১৭। ৫০০ সর্বোচ্চ ঋণখেলাপী প্রতিষ্ঠানের Key Persons দেরকে মোকাবেলা করার জন্য Special Tribunal গঠন করা হোক।

১৮। সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি Loan rescheduling নিষিদ্ধ করা হোক।

১৯। আর্থিক খাতের জন্য আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ করে দুর্নীতির মোকাবেলা করা হোক।

২০। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হোক।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ

২১। ক) ISP এর উপর ধার্য সকল লাইসেন্স ফিস/বাধা-নিষেধ বাতিল করা হোক।

খ) Internet ব্যবহারকে অবাধ করা হোক।

গ) T&T কে ধাপে ধাপে Stakeholder দের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা হোক।

ঘ) সাবমেরিন ক্যাবল প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষরের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হোক।

ঙ) ই - গভর্নেন্স এর কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক।

দুর্নীতি দমন

২২। ক) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হোক।

খ) নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ অবিলম্বে সম্পন্ন করা হোক।

গ) Community Policing System চালু করা হোক।

ঘ) পুলিশ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করে সিটি গভর্নমেন্ট, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

বিশ্বায়ন

২৩। WTO Negotiation Process এ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমাজের Stakeholder দের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়া জোরদার করা হোক, এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট Cell গঠন করা হোক।

অন্যান্য

২৪। জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণার অন্ততঃ ছয়মাস আগে বাজেটের মূল বিষয়াদি (প্রধান ব্যয়খাত অনুযায়ী অনুমিত/সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ, উৎস অনুযায়ী সম্ভাব্য আয়, ইত্যাদি) প্রকাশ করতে হবে।

২৫। উন্নয়ন বাজেটে অর্থবছরের মাঝখানে অননুমোদিত কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবেনা।

২৬। সরকারী ব্যয় দেখ-ভাল করার জন্য "Public Expenditure Monitoring Committee" গঠন করতে হবে।

২৭। সকল ধরনের দুর্নীতি, দুর্নীতির উৎস ও দুর্নীতি নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

২৮। বছরের ১ জানুয়ারী কিংবা ১ এপ্রিল থেকে অর্থ-বছর গণনা করা হোক।

বাংলাদেশ সরকারের ২০০২-২০০৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
ড. আবুল বারকাত **

ভূমিকা

এবারের বাজেটসহ রেকর্ড সংখ্যক ৯ বার জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী। তাঁকে মোবারকবাদ।

এবারের বাজেট সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করার আগে ভুমিকা ও প্রেক্ষিত হিসেবে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। কোনো এক বছরের বাজেট একটি চলমান প্রক্রিয়ায় একটি ঘটনা। খুব গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই। তবে চলমান প্রক্রিয়া কি লক্ষ্যে ও চরিত্রে বিবর্তিত হচ্ছে তা প্রথমে বোঝা দরকার।

আমাদের সংবিধানে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। এই লক্ষ্যে নীতি প্রণীত না হলে, পরিকল্পনা গৃহীত না হলে এবং বাজেট বিন্যস্ত করা না হলে সংবিধান লংঘিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা দেশে বিরাজমান আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে। ধনী-দরিদ্রদের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল সবলের বৈষম্য বাড়ছে। দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের দুষ্ট চক্রের দৌরাত্ম্যে আজ সাধারণ জনজীবন অতিষ্ঠ। আইন শৃংখলার অবনতি অব্যাহত। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।
তারিখ : ১৪ জুন ২০০৩

তো আমরা যাচ্ছিই না বরং চলছি ঠিক উল্টো দিকে। সংবিধানের ঐ বাধ্যবাধকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গোষ্ঠি-ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান - সংবিধান বলছে। কিন্তু দেখা যায় আইন অহরহ ক্ষমতাবানদের পক্ষে বিধান দিচ্ছে। বিচার বিভাগেও ব্যাপক দুর্নীতি বিরাজমান, বিভিন্ন জরিপে দেখা গিয়েছে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক না করার কারণে বিচার বিভাগের ওপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বিভিন্ন ভাবে চলছে অহরহ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে - একথা আমরা বলছি, উন্নয়ন ('দাতা') ফোরামের সদস্যরা বলছে। এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রীও বলেছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য অনেক কমিশন কমিটি গঠিত হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে। প্রতিবেদন তৈরী হয়েছে প্রতিবার, অনেক সুপারিশ রাখা হয়েছে। কিন্তু দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য চলছে অব্যাহত ভাবে। সরকারী সেবা প্রকৃত বিচারে সরকারী নির্যাতনে পর্যবসিত হয়েছে।

জনগণ ভোট দেয় কেননা তারা রাজনৈতির ক্ষমতার উৎস। তারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস একথা প্রায়স রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দকে বলতে শোনা যায়। কিন্তু জনগণ ভোট দিয়েই খালাস। ভোটে যারা জয়ী হয় তারাই ক্ষমতার অধিকারী বনে যায়। বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেনি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি বলে। কাজেই তারা রয়ে গেছে প্রকৃত অর্থে অপাংতেয়। নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার।

সমাজের সুষ্ঠু অগ্রগতির লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়। প্রকট ও ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য বিরাজমান থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। বৈষম্য নিরসন, সকলের জন্য ন্যায্যভাবে সামজিক সুবিধাদির নিশ্চিত করণ, সুবন্টিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান। সমাজ রুপান্তরের সকল প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনভিত্তিক হতে হবে। এই ধরনের একটি সামাজিক বিবর্তন কাঠামো তৈরী করা হয়নি। বাজেটেও তাই তার প্রতিফলন ঘটেনা - এবারও ঘটেনি। কাজেই টেকসই উন্নয়নের কথা যে আমরা বলি তা কথার কথাই থেকে গেছে এ পর্যন্ত। যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান তা সমাজ বিভাজক ও এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদে বিশৃংখলা ও অধঃপতনের দিকে এদেশের ধাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশৃংখলার নিদর্শন এখনই বিদ্যমান।

আর একটি কথা। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন দেশের অর্থনীতিকে, সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বিভিন্ন খাতে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তার খুব সামান্যই আসল কাজে লাগে। বৃহদাংশ দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তায়নের নায়কদের কবলে চলে যায়। অর্থমন্ত্রী কিছু দিন আগে বলেছেন যে এক মাইল সড়ক নির্মাণে ১০ কোটি টাকা খরচ

হয় কিন্তু প্রকৃত খরচ ২ বা ৩ কোটি টাকা হওয়ার কথা। কাজেই তিন চতুর্থাংশ চলে যায় দুর্নীতিবাজ ও অসৎ মধ্যস্বত্বাগিদের পকেটে। এ রকমটি শুধু সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রেই যে ঘটছে তা নয়, সকল ক্ষেত্রেই ঘটছে। কাজেই দুর্নীতি দুবৃত্তায়ন নির্মূল না করতে পারলে বাজেট বা পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কি? অর্থমন্ত্রীকে, সরকারকে সর্বাগ্রে এই প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হবে। অন্যথায় দারিদ্র নিরসনসহ বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের কর্মসূচী নিয়ে কথা বললে তা কথার কথা থেকে যাবে। বাস্তবায়িত হবে না। কথায় ও কাজে বিরাট ফারাক থেকে যাবে।

এবারের বাজেট

এবার চলমান আর্থ-সামাজিক নীতি কাঠামোর আওতায় প্রণীত ২০০৩-০৪ বাজেটের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।

এবারের বাজেটে প্রথম লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ নির্ভরতা বৃদ্ধি। এর ফলে দাতাদের শর্ত আরোপ প্রক্রিয়া ও খবরদারি আরোও জোরদার হবে। এছাড়া বাজেট বক্তৃতায় বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বাংলাদেশ উন্নয়ন (দাতা) ফোরামের অন্যান্য সদস্যের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সরকারের সাফল্য প্রমানের যে প্রবনতা বাজেট বক্তৃতায় দেখা গেল তা দেউলিয়া মানসিকতার পরিচায়ক বলে আমাদের মনে হয়। বৈদেশিক অনুদান-ঋণ নির্ভরতা ও বৈদেশিক খবরদারী নির্ভরতার সাথে সাথে এবার বৈদেশিক সার্টিফিকেট নির্ভরতা যোগ হল। এসবই দেশের সার্বভৌমত্যকে খর্ব করছে। দেখা যাচ্ছে, স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য নয় বরং পরনির্ভরতার চেতনা দ্বারাই বাজেট প্রনেতাদের মানস আচ্ছন্ন। স্মার্তব্য যে, বছরে যে ১৩০ বা ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান হিসেবে পাওয়া যায় এর চেয়ে অনেক বেশি অর্থ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা দেশে পাঠান - বর্তমানে তা ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার বা তার বেশি। ঐ পরিমান অর্থের জন্য দাতাদের কাছে কেন এত নতজানু হওয়া তা বোধগম্য নয়।

আগেই বলা হয়েছে চলমান সমাজ-বিবর্তন পক্রিয়া মানব কেন্দ্রিক টেকসই উন্নয়ন ভিত্তিক নয়। এটি ব্যক্তি এবং আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক শক্তি ভিত্তিক যার ফলে ধনী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবানরা সৃষ্ট সকল সুযোগ ও সুফলের সিংহভাগ ভোগ করেছে। বিশাল দরিদ্র-দুর্বল জনগোষ্ঠি থেকে গেছে বিচ্ছিন্ন, বঞ্চিত।

প্রতিবারের মত এবারও দারিদ্র হ্রাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে দারিদ্র হ্রাস কৌশল পত্রের ভিত্তিতে দারিদ্র হ্রাস তরান্বিত করা হবে। দারিদ্র হ্রাস আমাদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে সব সময় চিহ্নিত।

কিন্তু আনুপাতিকভাবে দারিদ্র কিছু কমলেও দরিদ্রের সংখ্যা এ দেশে বেড়েই চলেছে। দারিদ্র হ্রাসের মন্থর গতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। বর্তমানে দেশের অর্ধেক মানুষেরই দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান। সংখ্যায় সাড়ে ছয়/সাত কোটি। স্বাধীনতা অর্জনের সময় যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এদেশে বাস করতেন সেই সংখ্যার প্রায় সমান মানুষ এখন দরিদ্র। দারিদ্র হ্রাস কৌশল পত্রের নীতি কাঠামো সেই একই রাখা হয়েছে যা বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন ও কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর ভিত্তি হিসেবে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশসহ অনেক দরিদ্র দেশে প্রবৃদ্ধির হার তেমন বাড়েনি এবং দারিদ্র তেমন কমেনি। তবে বৈষম্য বেড়েছে প্রকটভাবে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ সনে সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠির জাতীয় আয়ে অংশীদারিত্ব ছিল ৫ দশমিক ২১ শতাংশ তা ২০০০ সনে কমে দাড়িয়েছে ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশে। অন্যদিকে ঐ একই সময়ে সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশের অংশীদারিত্ব বেড়েছে ৫০ দশমিক ০৮ শতাংশ থেকে ৫৫ দশমিক ০২ শতাংশে।

দারিদ্র হ্রাস কৌশল পত্র আশ্রয় করে দ্রুত দারিদ্র হ্রাস করা যাবে না। এটি আসলে প্রণীত হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের তাগিদে অন্যথায় বৈদেশিক ঋণ-অনুদান পাওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রণীত দাবী হ্রাস কৌশলপত্র এটি নতুন বোতলে পুরাতন ঔষধ ঢেলে বিন্যস্ত একটি প্রতারণামূলক দলিল।

সফল দারিদ্র নিরসনের জন্য যে সকল শর্ত পূরণ করা বাঞ্চনীয় তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো। অন্যান্য শর্তের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, তাদের জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। প্রবৃদ্ধির হার ২০০২-০৩ সালে ৫.৩ শতাংশ ছিল এবং আগামী বছরে ৫.৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। দারিদ্র নিরসনে অবদান রাখার জন্য প্রবৃদ্ধির এই হার অপ্রতুল। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে এপর্যন্ত প্রবৃদ্ধির হার বছরে গড়ে ৫.৩ শতাংশের মত। দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির যে ৪.৭ শতাংশ হার অর্জিত হয়েছে তা থেকে সামান্য বেশি কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে যথেষ্ট নিম্ন পর্যায়ের ৫.৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধির বেড়াজালে ১৯৯০-এর মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ আটকে আছে।

দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি দারিদ্র হ্রাসের একটি মৌলিক হাতিয়ার। দারিদ্রের রকমফের বিশ্লেষণ করে দেশে যে স্থানে যে সকল মানুষের সামনে যে বাস্তবতা বিরাজমান সেই অনুসারে কর্মসংস্থান কর্মসূচী ও প্রক্রিয়া বিন্যাস করা বাঞ্ছনীয়। কর্মসংস্থান বিষয়টি বাজেট বক্তৃতায় কোনো গুরুত্বই পায় নি।

প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরী। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে বিনিয়োগ বাড়ছে না। আর সম্প্রতি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রায় আসছে না বললেই চলে। অবশ্য বিগত বছর গুলিতে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে তা মূলতঃ গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান খাতে; উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে নয়। উৎপাদনশীল খাতসমূহে দেশজ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ কিছুটা কমে গেছে বিগত কয়েক বছরে (১৯৯৯-০০ সনে দেশজ উৎপাদনের ৭.৪১ শতাংশ থেকে ২০০১-০২ সনে ৬.৩৭ শতাংশে নেমে গেছে)। আর বেসরকারী বিনিয়োগ ঐ সময়ে বেড়েছে অতি সামান্য (১৫.৬১ শতাংশ থেকে ১৬.৪৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে মাত্র)।

শুধু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ (দেশী বা বৈদেশিক) বাড়ানো যায় না তা আমরা ভাল করেই জানি। দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন, আইন শৃংখলা সমস্যা, সন্ত্রাস, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব দেশীয় বিনিয়োগে স্থবিরতার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ না আসার আসল কারণ। বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে সুনির্দ্দিষ্ট কোন বক্তব্য বা প্রস্তাব বাজেটে দেখা গেল না।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষিতে এপর্যন্ত অব্যাহত অগ্রগতির মূল দাবিদার এ দেশের কৃষক। তবে ভর্তুকী ও ঋণ প্রদান করে বিগত সরকার সহায়তা করে। বর্তমান বাজেটে এই সহায়তা বেশ বাড়ানো হয়েছে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ জোরদার করা প্রয়োজন। তবে দুর্নীতি যেন এই অর্থ খেয়ে না ফেলে সেদিকে নজর দিতে হবে। দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীই সহায়তার মূল দাবিদার একথা মনে রেখে কৃষি সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কিভাবে দারিদ্র কৌশল পত্র তৈরী করতে বলল তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কৃষি উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেননা কৃষিতেই দারিদ্র হ্রাসের একটি বড় শক্তি নিহিত। কিন্তু চালের ওপর আমদানী শুল্ক ৪৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭.৫ শতাংশ করার ফলে উদারীকৃত চাল আমদানী নীতি বাংলাদেশে চাল উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এমনিতেই দেশে উৎপাদন বাড়লে ধান-চালের দাম পড়ে যায় এবং কৃষকরা সমস্যায় পড়ে। স্বল্প শুল্ক ভিত্তিক আমদানীকৃত চালের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে কৃষকদের সমস্য আরো বাড়বে।

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের (agro-processing industry) আয়কে করমুক্ত রাখার মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের মধ্যে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ছাড়াও কৃষি-সহায়ক এবং অন্যান্য শিল্প রয়েছে - আর অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও

মাঝারি শিল্পের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে করণীয় (ঋণ, প্রযুক্তি, তথ্য, বাজারজাতকরণ সহ অন্যান্য সহায়তাদান) সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলই অবগত। কিন্তু বাজেট বক্তৃতায় এ বিষয়ে কোন সচেতনা দেখা গেল না- পদক্ষেপের কথা দুরে থাক। উপরন্তু বাজার উদারীকরণের ফলে বৈদেশক পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে । অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে কোনো নীতিগত বা কর্মসূচী সংক্রান্ত পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ খাত অতীতের মত আবারও উপেক্ষিত রয়ে গেল।

এটি প্রশংসনীয় যে, রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিলে এবারও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সর্বোচ্চ (৬৭৪০ কোটি টাকা)। তবে উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তির স্থান চতুর্থ এবং এবারের বরাদ্দ (২৭০৮ কোটি টাকা) গত বছরের তুলনায় ২৯০ কোটি টাকা কম। প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বরাদ্দ কমেছে ৪৮০ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং তা থেকে লাভবান হতে হলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য্য। আর দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একটি মৌলিক উপদান। বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষার অগ্রগতির প্রয়োজনকে অবহেলা করা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বরাদ্দ হ্রাস জাতির এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থি। একদিকে বলা হল শিক্ষার মানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আর অন্যদিকে বরাদ্দ কমানো হল। বরাদ্দ কমিয়ে কেমন করে শিক্ষার মান বাড়ানো হবে তা বলা হয়নি। অবশ্য বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার করা না হলে বরাদ্দ থাকলেই কি আর না থাকলেই কি? তবে সেটা অন্য বিষয় - সকল খাতে বিরাজমান দুর্নীতি অপচয় ও দুর্বৃত্তায়ন দমন করার তাগিদ এই প্রতিবেদনে আগেই দেওয়া হয়েছে।

মানব দক্ষতা উন্নয়নে আরেকটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্য। এক্ষেত্রে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের স্থান ষষ্ঠ। দেশে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ওপর শুল্ক কর রেয়াত দেয়া হয়েছে অথবা সর্বনিম্ন হারে (৭.৫%) অব্যাহত রাখা হয়েছে। ভাল কথা। তবে যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় তার মান নিশ্চিত করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। আর যে সকল বেসরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতাল ঢাকা ও অন্যান্য শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ধনীরাই ব্যবহার করতে পারে। খরচ এত বেশি যে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ এগুলোর ধারে কাছেও যেতে পারে না। দরিদ্রদের জন্য কার্যকর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার যে সঙ্গত দাবি রয়েছে তা কেমন করে বাস্তবায়িত হবে বা আদৌ সে দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না তা বলা হয়নি। গ্রামে গঞ্জে দরিদ্র মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত - তারা এখনও হাতুড়ে কবিরাজ-চিকিৎকদের ওপর নির্ভরশীল। মূলতঃ দরিদ্ররাই যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া, হাম, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ ও মৃত্যু,

নিউমোনিয়া ও যৌন সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়- এগুলো বিশ্বসাস্থ্য সংস্থা (WHO) দারিদ্রের রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই রোগসমূহের অনেকগুলো দ্বারা বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়। প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রায় নেই শুধু তা-ই নয়, এ বিষয়ে শাসকদের সচেতনতার দারুণ অভাব রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান সরকারের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা পরিস্থিতি দুর্বিসহ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী সমূহের সদস্যদের বেতন ভাতা কিছু বাড়িয়ে, নতুন নতুন ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করে, এবং তাদেরকে অধিক পরিমানে যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র দিলেই আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হবেনা। অবশ্যই এ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন আছে। আসল বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতাবান গডফাদার সংস্কৃতি, এবং আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে, গডফাদার সংস্কৃতির মূলোৎপাটন না করতে পারলে এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ না করলে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। বাজেট বক্তৃতায় এসকল বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

২০,৩০০ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটকে কেউ কেউ উচ্চভিলাসী বলছেন। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। একটি গরিব দেশের কি স্বপ্ন দেখতে নেই? কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এর মধ্যে ১০,৩০০ কোটি টাকা বা ৫১ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান থেকে আসবে বলে প্রস্তাব রেখে স্বপ্ন দেখা 'গাছে কাঠাল গোঁফে তেল' দেওয়ার মত ব্যাপার। এ অর্থ পেতে হলে অনেক শর্ত মানতে হবে, অনেকদিন ধরে অনেক ব্যয় করে আলোচনা পর্যালোচনা চালাতে হবে। শেষ পর্যন্ত কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তা কেউ বলতে পারবে না। তবে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ কমিয়ে উন্নয়ন বাজেটে যথেষ্ট অর্থ স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা যেত। সে পথে পা বাড়ানো হয় নি। এখনও বিশাল মন্ত্রী পরিষদসহ প্রশাসনের বে-সামরিক ও সামরিক খাতে যে বর্ধিত ব্যয় করা হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো নির্দিষ্ট কথা বলা হয়নি। আবার অব্যাহত প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন চক্র ভেদ করে কেমন করে এই উন্নয়ন কর্মকান্ড বিন্যস্ত করা হবে এবং কেমন করেই বা তা বাস্তবায়ন করা হবে সে সম্বন্ধে দিক-নির্দেশনা বাজেট বক্তৃতায় নেই। কাজেই বাস্তবায়ন পর্যায়ে আমাদের সংশয় অব্যাহত থেকে গেল।

এই উদার বাণিজ্য-ভিত্তিক বিশ্বায়নের যুগে (যাতে বাংলাদেশ দ্রুত আমদানী শুল্ক হার কমিয়ে অংশগ্রহণ করছে) আমদানী বাড়ছে, বাড়বে। পাশাপাশি রপ্তানী বাড়াতে না পারলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। রপ্তানি বহুমুখীকরণের কথা বলা হয়েছে। দেশে একটি উৎপাদন-রপ্তানী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এই

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রশ্ন সামনে এসে যায়। বাজেট বক্তৃতায় এ বিষয়ে কোনো পরিষ্কার বক্তব্য নেই।

আমদানীকৃত চিনি (২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে), বিভিন্ন ফল (৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে) এবং দারুচিনি, লবঙ্গ, জিরা, গোলমরিচ ইত্যাদি মসলার (৩০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ) ওপর সম্পূরক কর বাড়ানোর প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে উৎপাদিত ও সম্ভাব্য অনেক পণ্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ পাবার দাবি রাখে। আমদানীকৃত বিদেশী পন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এ সকল পণ্য মার খেয়ে যাচ্ছে। কাঠামোগত সংস্কার ও বাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়ায় কোনো একদিন এসকল পণ্য দেশে স্বকীয়তা পাবে এরকম কথা যারা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কবর দেওয়া হয়ে গেলে তো কেউ উঠে আসতে পারে না। আমাদের সম্ভাবনাময় পণ্যগুলোর অপমৃত্যু ঘটে গেলে এগুলোকে জাগানো যাবে না।

সর্বশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হলো। বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ থেকে নারী উন্নয়নকল্পে ব্যয় হতে পারে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক কারণে নারী উন্নয়নের যে বিশেষ প্রয়োজন এবং নারী উন্নয়নে এদেশে যে অঙ্গীকার বিদ্যমান সেই প্রেক্ষিতের প্রতিফলন বাজেটে ঘটেনি। বাজেটের সংক্ষিপ্ত সারের ৩ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত সম্পদ ব্যবহার বিন্যাসে নারী উন্নয়নের জন্য সরাসরি কোনো বরাদ্দ নেই। কথায় এবং কাগজে কলমে নারী উন্নয়নের যে আওয়াজ শোনা যায় নারী উন্নয়ন শুধু তাতেই বন্ধী থাকুক তা আমরা চাই না। জোরালো, বিকেন্দ্রায়িত এবং সকল স্তরের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সাপেক্ষ নারী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ সরকারের ২০০৫-২০০৬ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুপারিশমালা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
ড. আবুল বারকাত **

মুখবন্ধ

আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি-কৌশল প্রণীত না হলে, পরিকল্পনা গৃহীত না হলে এবং বাজেট বিন্যস্ত করা না হলে সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। বাজার ব্যবস্থা ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে চালু রয়েছে তা বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করছে: বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা– পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করছে। আইন শৃংখলার অবনতি অব্যাহত। আইন-বিচার বাস্তবত: ক্ষমতাবানদের পক্ষে। দুঃশাসনের মাত্রাতিরিক্ততা সুশাসনকে কাগুজে বুলিতে রূপান্তরিত করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সরকারী বিভিন্ন সামাজিক ও সেবাখাত ভঙ্গুর প্রায়। সংবিধানে বিধৃত সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির দিকে না গিয়ে আমরা চলেছি উল্টো পথে।

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত, BEA Strategic Development Dialogue 2005-II-এ উপস্থাপিত, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা: ১৯ মে ২০০৫

'সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা'– এ মূল নীতির মাধ্যমে এক সমতাভিমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে এখনো বহাল রয়েছে। সুতরাং সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে বৈষম্য নিরসনমুখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে এবং দারিদ্র সৃষ্টির সকল উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু দুর্বৃত্তায়ন-দুর্নীতির কাঠামোতে জনগণের কাছে সরকারী সেবা প্রকৃত বিচারে সরকারী নির্যাতনে পর্যবসিত হয়েছে– এটাই বাস্তবতা। উৎকোচ ব্যতিরেকে কোন সরকারী সেবাই মিলছেনা। সমাজ-অর্থনীতি উত্তরোত্তর অধিক হারে সন্ত্রাসী ও অপরাধী উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সাধারণ জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। অথচ আমরা স্পষ্ট জানি– দুর্নীতি দারিদ্র পুনরুৎপাদন করে। এমনি একটি সংকটজনক প্রেক্ষাপটে আজকের এই মতবিনিময় সভা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে চৌদ্দ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে মানব উন্নয়ন দর্শনই হওয়া উচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় দর্শন। কারণ, উন্নয়ন হল স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জন্য পাঁচ ধরনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতেই হবেঃ অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়াতে হবে, আর অন্যদিকে প্রবৃদ্ধির ফল ব্যপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মানব উন্নয়ন দর্শনের প্রতি আস্থা এবং এ দর্শন বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে সরকারী বাজেটের অগ্রাধিকার নির্ধারণে আজো প্রকৃত বিচারে আমাদের সংবিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ মানব উন্নয়নকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব প্রদানের এই দর্শন প্রতিফলিত হয়নি। কারণ, বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হচ্ছে যে সাধারন প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতের মত অনুৎপাদনশীল কার্যক্রমে সরকারের ব্যয় আজো অগ্রহণযোগ্যভাবে বেশি রয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা খাতের 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণ 'অদৃশ্যমান' উন্নয়ন ব্যয় হয়ে থাকে তা যেহেতু আমাদের জানার উপায় নেই তাই আমাদের পক্ষে প্রতিরক্ষা খাতে মোট সরকারী ব্যয় শুধু অনুমানই করা সম্ভব। আমরা মনে করি বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের পেছনে সরকারী ব্যয়ের স্ফীতি মানব উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্খিত অগ্রগতিকে অব্যাহতভাবে বিঘ্নিত করে চলেছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ইস্যুটিকে আমরা যেভাবে দেখি তাহল– প্রতিরক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের সাথে মানব উন্নয়ন ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে ব্যাপক মাত্রার দারিদ্র, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্লথ গতি এবং সরকারী ব্যয়-বরাদ্দে

ভারসাম্যহীনতার কারণে ধাপে ধাপে প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাসের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। একথা আমরা আগেও বলেছি।

সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত সরকারী ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কারকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেয়া হলে আধুনিক প্রযুক্তির, বিশেষতঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় এ-দুটো খাতে সরকারী ব্যয় অতি দ্রুত যথেষ্ট কমিয়ে আনা সম্ভব। আমলাতন্ত্রের বহুমুখী জাল বিস্তারের সহজাত প্রবণতা বাংলাদেশে প্রবল। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি লাগাতারভাবে বলে আসছে যে, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে শুধু সরকারী রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যেই নয়, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, দীর্ঘসূত্রিতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং অর্থনীতির সকল উৎপাদনশীল খাতের অগ্রগতির পথে বাধা অপসারণের উদ্দেশ্যেও। সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কালো পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে উৎপাদনশীল সকল খাত থেকে। দেশীয় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। সকল স্তরের জনগণ দুর্নীতির অসহায় শিকারে পরিণত হচ্ছেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। অথচ এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগত অধিকহারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠির ধারক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ হেন দুর্যোগের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে একুশ শতকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখানো এক বড় মাপের প্রতারণা। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের সরকারগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণ করার প্রয়াসে শিক্ষাকে বাজারের পণ্যে পরিণত করার হুজুগে মেতে উঠেছে, এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্যকে সমাজ জীবনে আরো দৃঢ়মূল করার আত্মঘাতী পথে অগ্রসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এহেন অসম শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন দারিদ্র পুনরুৎপাদন করছে অন্যদিকে তা বৈষম্য বৃদ্ধি করছে।

স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যখন উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সাথে তুলনা করছে তখন এ খাত উত্তরোত্তর অধিকহারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার সর্বনাশা প্রবণতা যথেষ্ট মাত্রায় জোরদার হয়েছে– রাষ্ট্রীয় আয়োজনে কিংবা সহায়তায়। সমাজের বিত্তশালী অংশ এবং মধ্যবিত্তরা সুচিকিৎসার আশায় বিদেশে ছুটছেন কিংবা ব্যয়বহুল প্রাইভেট ক্লিনিকের আশ্রয় নিচ্ছেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প বরাদ্দ, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, অবহেলা, অসদাচারণ ও জরাজীর্ণতার প্রতীক হয়ে আছে যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য মারণাঘাতের শামিল।

বাজেট সম্পর্কে সুপারিশমালা

উল্লেখিত মুখবন্ধের আলোকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আবারো ঘোষণা করছে, বাংলাদেশের সরকারী বাজেটের " কাঠামোগত রূপান্তর" অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সরকারী বাজেটের রাজস্ব ব্যয়, রাজস্ব আয়, সরকারী ভর্তুকি এবং বিভিন্ন উন্নয়ননীতির বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ সরকারের সক্রিয় বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

সরকারী ব্যয়

১। **প্রতিরক্ষা**

ক) প্রতিরক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস কার্যকর করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ বছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ টাকার অংকে গত অর্থ বছরের স্তরে স্থির রাখা হোক।

খ) বিভিন্ন খাত-উপখাতে প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দকে প্রতিরক্ষা খাতেই দেখানো হোক।

গ) জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা ও বির্তকের ব্যবস্থা করে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা হোক। সংসদের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যয় রবাদ্দ সুনির্দিষ্ট করা হোক।

ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'রিজার্ভ আমর্ড ফোর্সেস' গড়ে তোলার প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপন করা হোক, যাতে স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রয়োজনে ঐ রিজার্ভ বাহিনীকে তলব করে যে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধকে সার্বজনীনতা প্রদান করা যায়।

ঙ) অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্থলে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের স্তরে সংখ্যা-হ্রাস নীতি ধাপে ধাপে কার্যকর করে বছর দশেকের মধ্যে স্থায়ী বাহিনীসমূহের আকার-আয়তন উল্লেখযোগ্য ভাবে (অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ) কমিয়ে আনা হোক।

চ) প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত সরকারী ভর্তুকি ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধেসমূহ পর্যায়ক্রমে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা হোক। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খাদ্য-ভর্তুকিকে যৌক্তিক স্তরে অবনমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। (বাংলাদেশের কৃষক ভর্তুকি পাবার যোগ্য বিবেচিত না হলে সমাজের আর কারো সরকারী ভর্তুকি পাবার অধিকার থাকা যৌক্তিক নয়!)

২। সাধারণ প্রশাসন

সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যয় ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বাজেটে প্রতিফলিত হওয়া জরুরী:

ক) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের জনকল্যাণমুখী প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের আন্তরিক প্রয়াস নিয়ে প্রশাসনের আকার-আয়তন ছেঁটে ফেলা হোক।

খ) কারণিক পর্যায়ের কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রশাসনে দ্রুত কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হোক এবং সকল কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে Crash Programme নিয়ে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হোক।

গ) মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ব্যুরোর সংখ্যা হ্রাস সম্পর্কিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হোক।

ঘ) জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

ঙ) ঢাকাসহ দেশের সকল সিটি করপোরেশনে 'সিটি গভর্নমেন্ট' গঠন করা হোক। রাজউক, চ.উ.ক, খু.উ.ক-এর মতো আলাদা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা হোক।

চ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজস্ব আহরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর/ফিস্ আহরণের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হোক।

৩। শিক্ষা

শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান বৈষম্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং মানের অবক্ষয় রোধ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ:

ক) শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দ (উন্নয়ন ও রাজস্ব উভয়ই) আস্তে আস্তে জিডিপি-র ৮ শতাংশে উন্নিত করার লক্ষ্যে এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হোক।

খ) শিক্ষার আন্ত-খাত বরাদ্দ rationalise করা হোক। এ ক্ষেত্রে মূল ধারার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হোক।

গ) যে ৩০ লাখ শিশু এখনও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত তাদের বঞ্চনার কারণ দূর করে দ্রুত ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হোক।

ঘ) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একীভূত করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

ঙ) ক্যাডেট কলেজ ও পাবলিক স্কুল পরিচালনায় প্রদত্ত সরকারী ভর্তুকি ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হোক। পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষা ধারাকে মূল ধারার সাথে একীভূত করা হোক।

চ) নোট বই মুদ্রণ, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হোক এবং শাস্তির বিধান চালু রাখা হোক।

ছ) যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ সুবিধে সম্প্রসারিত হয়েছে সেখানে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার ল্যাব স্থাপন করে সকল ছাত্রছাত্রীকে কমপিউটার সম্পর্কিত কোর্স গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হোক। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বাজেটে ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলায় অন্তত: দু'টি স্কুল এবং একটি কলেজে কমপিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হোক।

জ) প্রাইভেট সেক্টরের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অমুনাফা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হোক।

জ) কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষিদ্ধ করা হোক।

৪। স্বাস্থ্য

ক) স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ কমপক্ষে ৫০% বৃদ্ধি করা হোক (উল্লেখ্য যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে যখন স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ১২ ডলার হওয়া উচিত তা আমাদের দেশে মাত্র ৩ ডলার)।

খ) স্বাস্থ্য খাতে "দারিদ্রের রোগ" (diseases of poverty) নির্ণায়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ-প্রাধান্য দেয়া হোক যার অন্তর্ভুক্ত যক্ষা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, ডায়রিয়া, হাম, এবং আর্সেনিকোসিস। (অনতিবিলম্বে দারিদ্রের রোগ হ্রাস করতে না পারলে ভবিষ্যতে সরকার ও পরিবার উভয়েই স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবে।)

গ) সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে অধিকতর ফলপ্রদ করার স্বার্থে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে জরুরী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হোক।

সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা

৫। চোরাচালান সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে 'Selective Liberalisation, Selective Control' নীতির অধীনে পদক্ষেপসমূহ:

ক) যেহেতু মার্চ মাসে ভারতীয় বাজেট ঘোষিত হয়, তাই ভারতের শুল্ক ও কর ব্যবস্থাকে আইটেমভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে যেসব আইটেম চোরাচালানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সেগুলোর ওপর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শুল্ক এবং কর হ্রাস/বৃদ্ধি করে দামের পার্থক্য নিরসন করা হলে চোরাচালান কমে আসবে। এ উদ্দেশ্যে ট্যারিফ কমিশন এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুনির্দিষ্ট কোষ গঠনের ব্যবস্থা করা হোক।

খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গবাদিপশুর চলাচল সম্পূর্ণ অবাধ করে সম্পর্কিত ৫০০ টাকা/১০০০ টাকা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা রহিত করা হোক।

গ) নিত্য প্রয়োজনীয় মসলাপাতি, ফলমূল, ডাল বা খাদ্যদ্রব্য যা আমাদের ঘাটতি রয়েছে কিংবা যা এদেশে উৎপাদিত হয়না তা আমদানি শুল্কমুক্ত করে দেয়া হোক।

ঘ) বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্য ভারতে পাচার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে ঐ আইটেমগুলো চি?হ্নত করে ওগুলোর আমদানি শুল্ক সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হোক।

৬। ব্যক্তি ও কর্পোরেট পর্যায়ে ব্যাপক কর-রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা এবং কর-নেটের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর-প্রশাসনের সংস্কারসহ বাজেটে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৭। দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর উদ্দেশ্যে সকল ধরণের জেনারেটরে গ্যাস

সংযোগ প্রদানের বাধা-নিষেধ রহিত করা হোক। ৫/১০/২০ কিলোওয়াটের জেনারেটরেও গ্যাস সংযোগ প্রদানকে উৎসাহিত করা হোক।

৮। সৌরশক্তি ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোলার প্যানেল এবং ফটো-ভলটায়িক ব্যাটারির কাঁচামাল আমদানি শুল্কমুক্ত করা হোক।

৯। গ্যাসের সিলিন্ডার উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিলিন্ডার উৎপাদনের কাঁচামাল ও মেশিনারি আমদানি শুল্কমুক্ত করা হোক। এলপিজি'র পাশাপাশি এলএনজি সিলিন্ডার গ্যাস উৎপাদনকে উৎসাহিত করে সাধারণ মানুষের কাছে দেশের গ্যাস সম্পদ পৌঁছে দেয়া হোক।

উন্নয়ন নীতি

১০। **মানব বঞ্চনা ও দারিদ্র**

ক) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কিভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র দূরীকরণসহ সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে।

খ) দারিদ্র নিরসন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গ) দেশে প্রতিবছর যে ৩০ লাখ মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে তার মধ্যে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয় না। এসব বেকারের স্বকর্মসংস্থানসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি বাজেটে উল্লেখ করা হোক। সেই সাথে ক্রমবর্ধমান যুব বেকারদের বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

ঘ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদ রক্ষা ও শ্রম-ভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনে বাজেটে উল্লেখ করা হোক।

ঙ) ভূমিহীন কৃষক, কর্মচ্যুত শ্রমিক, বাস্তুচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারী প্রধান খানা (যার অধিকাংশই দরিদ্র), বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (এখন প্রায় ৮০ লাখ মানুষ), বস্তিবাসি, চরের মানুষ, ক্ষুদ্রজাতিসত্তার আদিবাসী মানুষ (২৫-৩০ লাখ), নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের (২৫-৩০ লাখ) মানুষসহ সকল প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর প্রস্তাবনা বাজেটে উল্লেখ করা হোক।

১১। বিদ্যুৎ সুবিধা

যে ১১ কোটি মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত তাদেরকে কিভাবে ও কোন সময়ের মধ্যে (পর্যায়ক্রমে) বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। "২০২০ সনের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ" – জাতীয় এ লক্ষার্জনে বাজেটে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

১২। নারী উদ্দিষ্ট কর্মকান্ড

নারী-উদ্দিষ্ট (gender sensitive) প্রকল্পসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং উন্নয়ন বাজেটে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। এ ধরনের কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য হলো মহিলাদের কর্মসংস্থান, কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন (গার্মেন্টসসহ), মহিলাদের পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রয়ণ, বিধবাভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, শিক্ষকদের ৬০% মহিলা, মহিলাদের নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধে, ডে কোয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধে ইত্যাদি।

১৩। পরিবেশ

ক) পরিবেশ দূষণকারীদের জন্য বিশেষ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

খ) পরিবেশ দূষণকারী শিল্প কারখানা (যেমন ট্যানারি) লোকালয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তার আগে কেন্দ্রীয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

গ) সিএনজি কনভারশনের অবকাঠামো দ্রুত ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) নদ-নদীসহ বিভিন্ন জলাভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে।

১৪। ব্যাংক ঋণ

ক) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে তাদের ঋণের অন্তত ২৫ শতাংশ ১ কোটি টাকার কম পুঁজিসম্পন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হোক এবং প্রতিটি ব্যাংকে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সেল" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। Movable Assets-এর ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং সিস্টেমে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক।

খ) ৫০০ সর্বোচ্চ ঋণখেলাপী প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যক্তিবর্গের মোকাবেলার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হোক।

গ) সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি ঋণ-পুন:বিন্যাসকরণ নিষিদ্ধ করা হোক।

ঘ) আর্থিক খাতের জন্য আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ করে দুর্নীতির মোকাবেলা করা হোক।

ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হোক।

১৫। **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ**

ক) ISP- এর ওপর ধার্য সকল লাইসেন্স ফিস/বাধা-নিষেধ বাতিল করা হোক।

খ) ইন্টারনেট ব্যবহারকে অবাধ করা হোক।

গ) T&T- কে ধাপে ধাপে Stakeholder- দের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা হোক।

ঘ) ই-গভর্নেন্স-এর কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক।

১৬। **দুর্নীতি দমন**

ক) নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ অবিলম্বে সম্পন্ন করা হোক।

খ) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্নীতি দমনে কার্যকর করা হোক।

গ) Community Policing System চালু করা হোক।

ঘ) পুলিশ ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করে সিটি গভর্নমেন্ট, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হোক।

১৭। **বিশ্বায়ন**

ক) মুক্তবাজার ও অসম বিশ্বায়নের তোড়ে জাতীয় অর্থনীতি রক্ষার জন্য আমদানীমুখী উন্নয়ন কৌশলের বিপরীতে উৎপাদন ও রপ্তানীমুখী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হোক।

খ) WTO Negotiation Process-এ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমাজের Stakeholder -দের সাথে পরামর্শ প্রক্রিয়া জোরদার করা হোক এবং অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট সেল শক্তিশালী করা হোক।

১৮। **অন্যান্য**

ক) জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণার অন্তত: ছয়মাস আগে বাজেটের মূল বিষয়াদি (প্রধান ব্যয়খাত অনুযায়ী অনুমিত/সম্ভাব্য ব্যয়-বরাদ্দ, উৎস অনুযায়ী সম্ভাব্য আয় ইত্যাদি) প্রকাশ করতে হবে।

খ) উন্নয়ন বাজেটে অর্থবছরের মাঝখানে অননুমোদিত কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

গ) সরকারী ব্যয় দেখ-ভাল করা জন্য 'Public Expenditure Monitoring Committee' গঠন করতে হবে।

ঘ) সকল ধরনের দুর্নীতি, দুর্নীতির উৎস ও দুর্নীতি নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

ঙ) বছরের ১ জানুয়ারী কিংবা ১ এপ্রিল থেকে অর্থবছর গণনা করা হোক।

২০০৫-২০০৬ বাজেট ঘোষণা
উত্তর সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
অধ্যাপক আবুল বারকাত **

ভূমিকা

রেকর্ড ১১ বার বাংলাদেশের সরকারী বাজেট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বলে অর্থমন্ত্রীকে মোবারকবাদ জানাই।

বাজেট বক্তৃতার শেষের দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তিনি বলেছেন যা এখানে উদ্বৃত করা গেল: "আমরা স্বপ্ন দেখি সেই সোনার বাংলার যেখানে সম্পদের সুষম বন্টনে, শান্তিতে, সৌহার্দ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে আত্মনির্ভরশীল এক জাতি। আসুন আমরা আমাদের অফুরন্ত কর্মস্পৃহা, গভীর দেশপ্রেম ও অসীম অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করি। গড়ে তুলি দারিদ্রমুক্ত, সমৃদ্ধশালী, বৈষম্যহীন, উন্নত বাংলাদেশ। বিশ্বের দরবারে আসন করে নেই এক গর্বিত জাতি হিসেবে"।

তার এসব কথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংবিধানে বিধৃত সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদকে ধারণ করে।

এই আঙ্গিকেই আমরা প্রথমে প্রস্তাবিত বাজেটের একটি সার্বিক বিচার করতে চাই। অর্থমন্ত্রী একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক প্রাক-বাজেট সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, চলতি (২০০৪-০৫) বাজেট যে নীতিমালার আওতায় ও যে আঙ্গিকে

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা : ১১ জুন, ২০০৫

তৈরী করা হয়েছে ২০০৫-২০০৬ বাজেটে তা বহাল থাকবে এবং তাই থেকেছে। নীতিমালার ভিত্তি অবাধ বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন এবং উন্নয়ন বাজেটের আঙ্গিক হচ্ছে গতানুগতিক খাতওয়ারী বরাদ্দ, কোথাও কিছু বেশি কোথাও বা কিছু কম। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীতা ও সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। রাজস্ব আদায়কারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তাও জানানো হয়েছে। আসছে এক বছরে এক্ষেত্রে কতটুকুই বা অগ্রগতি হতে পারে, বিশেষ করে দুনীর্তির বিদ্যমান ব্যাপকতা ও গভীরতায়। দুর্নীতি দমন সম্বন্ধে শুধু বলা হয়েছে যে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বাজেটের এই গতানুগতিক ধারায় একটি প্রকট ভাবে বিভক্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি বিম্বিত। কেননা জনগণের ক্ষমতায়নের অনুপস্থিতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে ক্ষমতাবানরা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সকল বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই কালো টাকা সাদা করার মেয়াদ আরো একবছর বাড়ানো হল; বাস্তবায়ন করা যাবেনা জেনেও নির্বাচন সামনে বিবেচনায় বড় আকারের বাজেট প্রস্তাব করা হল; বাজেট ঘোষণার আগেই দরিদ্র কৃষক ও দরিদ্র সাধারণের ব্যবহার্য্য ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বাড়ানো হল কিন্তু অকটেনের দাম বাড়ানো হল না; স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হল কেননা এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে কিন্তু স্থানীয় সরকারগুলোকে রাজনৈতিক ও সংগঠনিকভাবে স্বশাসিত ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হল না; উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে সকলের সম্পৃক্ততার কথা বলা হল কিন্তু কি ধরনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় তা করার প্রয়াস নেওয়া হবে তা বলা হল না।

এ যাবত অর্জিত সফলতা এবং বিরাজমান মূল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাজেট বক্তৃতা শুরু করা হয়েছে এ যাবত আমাদের জাতীয় অর্জনগুলোর একটি বিবরণ দিয়ে । অবশ্যই আমাদের অর্জনগুলোকে তুলে ধরতে হবে। বাংলাদেশ তলাবিহিন ঝুঁড়ি নয়। এদেশের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে জানে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। অর্জিত সাফল্যগুলো তার প্রমাণ। কাজেই এগুলোকে সব সময় সামনে নিয়ে আসতে হবে।

সাফল্যগুলোকে সুসংহত করে এবং বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্মাণ করতে হয়। সাফল্যের পাশাপাশি তাই যে যে

কারণে আমাদের অগ্রযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে বা আরো গতি পাচ্ছে না, সমন্বিত রূপ লাভ করছে না এবং সর্বজনগ্রাহ্য ও সার্বজনিন হচ্ছে না সেগুলোরও বর্ননা থাকা জরুরি। কিন্তু বাজেট বক্তৃতায় তা অনুপস্থিত। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে:-

১। বাংলাদেশ একটি নয় প্রকৃত বিচারে মূলত দুইটি সমাজে বিভক্ত। একটির সদস্য সংখ্যা স্বল্প । এবং অন্যটির বিশাল। ক্ষুদ্র সমাজটির সদস্যরা ধনী-ক্ষমতাবান এবং বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। অবশ্যই এদের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক ব্যবধান রয়েছে। তবে মোটাদাগে এরা সবাই একইশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। অপরদিকে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র বিশাল জনগোষ্ঠি। এরা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। এদের মধ্যে আছে দুঃস্থ এবং অতিদরিদ্র থেকে দারিদ্রসীমার কাছাকাছি অবস্থানকারী বিভিন্ন পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে।

দারিদ্রের আরো বিশদ প্রকারভেদ বিবেচনায় আনলে ক্ষুধা, আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, সম্পদ/ভূমি প্রাপ্তি, নারীপ্রধান পরিবার এবং শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরণের প্রান্তিক মানুষকে বিবেচনায় নিতে হবে। দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে প্রণিত বাজেটে দারিদ্রের বিস্তারিত প্রকার ভেদ নির্ণয় করা প্রয়োজন ছিল। বাজেট বক্তৃতার শুরুতে আয়-দারিদ্রের কথা বলা হয়েছে। দারিদ্র হ্রাসে কার্যকর নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য দারিদ্রের এই সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। দারিদ্রের ধরন, প্রকৃতি, গভীরতাভেদে সংশ্লিষ্টদের দারিদ্র নিরসনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

এখানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই যে, অসুস্থ এবং ভঙ্গুর অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকারের ও মাত্রার দরিদ্র মানুষসহ সকলের অংশীদারিত্বমূলক একটি সুস্থ সমাজ সৃষ্টির পথ কেমন করে রচনা করা যায় এবং সেই পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।

২। সুশাসনের অনুপস্থিতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের জন্য স্বেচ্ছাতারিতা, অপশাসন ও দুর্নীতি পরায়নতার দ্বার অবারিত। এমনকি নিম্নতম পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অনেকেই উপরের তলার কারো সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সুযোগে দুর্নীতিতে অংশীদার হয়ে নিজের কিছুটা স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে পারে, নেয়ও। এই কুপথ এবং কুপ্রবৃত্তি বন্ধ করার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর সঙ্গে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এসব কথা সবাই বলে। কিন্তু কেন যেন অগ্রগতি হচ্ছে না।

৩। দুর্নীতি, ঘুষ, সম্পদ আত্মসাৎ, কালো টাকা, খেলাপি ঋণ, স্বজনপ্রীতি এবং দলীয়করণ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ত্বরান্বিতকরণ ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকল খাত এই ক্যান্সারে আক্রান্ত। দুর্নীতি দমন তাই জাতির সামনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতির ব্যাপ্তি ও বিন্যাস সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও জনসাধারনের কাছে তা প্রকাশ করা প্রয়োজন যাতে দুর্নীতি দমনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। দেশে সার্বিক বিবেচনায় মানবদক্ষতা খুবই নীচু স্তরের। পিছিয়েপড়াদের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-স্বাস্থ্য সেবার অভাবে দক্ষতা ও সৃজনশীলতার দারুন সংকট অথচ তাদের মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর। অপরদিকে সাধারণ ও উন্নয়ন-প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কর্মরতদের মধ্যেও রয়েছে যথাযথ দক্ষতা ও সৃজনশীলতার অভাব। কাজেই প্রশাসনে অনিশ্চয়তা, স্থবিরতা ও দীর্ঘসূত্রিতা প্রকট এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের স্বার্থ রক্ষা ও সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধতা বিরাজমান। এই অদক্ষতার সঙ্গে দুর্নীতির মিলনে এক মহাসংকটের সৃষ্টি হয়েছে। মানব দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সকল পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন, মুক্তচিন্তার বিকাশ, যাদের যেমন প্রয়োজন সেরকম প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ আমাদের সামনে আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৫। দেশের মাত্র ৩০-৩২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পায়। তাদের অধিকাংশই শহরের বাসিন্দা। বিদ্যুৎ-প্রাপ্তি আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে মাথা পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ১৩৯ কিলোগ্রাম (ওয়েল ইকুইভ্যালেন্ট), নেপালে ৩৫৮ কিলোগ্রাম, শ্রীলংকায় ৪০৬ কিলোগ্রাম, পাকিস্থানে ৪৪৪ কিলোগ্রাম, ভারতে ৪৮২ কিলোগ্রাম, ভিয়েতনামে ৪৫৪ কিলোগ্রাম, কোষ্টারিকায় ৮১৮ কিলোগ্রাম, মালয়েশিয়ায় ১৮৭৮ কিলোগ্রাম, যুক্তরাজ্যে ৩৮৭৮ কিলোগ্রাম, স্পেনে ৩০০৫ কিলোগ্রাম, সুইডেনে ৫৭৬৯ কিলোগ্রাম এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যে ৮১৫৯ কিলোগ্রাম। তুলনামূলকভাবে তো বটেই প্রকৃত অর্থেও বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বব্যাংকের ২০০২ বিশ্ব উন্নয়ন সূচক-এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জ্বালানী তেলের মাপে একেবারেই নিম্নস্তরে। আর্থ-সামাজিক । উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎ প্রাপ্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিকখাত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মাথাপিছু বিদ্যুৎ-প্রাপ্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে। এটি আরো একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে।

৬। যে কোনো পরিকল্পনা ও প্রোগ্রাম সঠিকভাবে বিন্যাস ও বাস্তবায়ণ করতে হলে সঠিক তথ্যভিত্তি থাকা বাঞ্চনীয়। বাংলাদেশে নানা বিষয়ে তথ্যের ছড়াছড়ি রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে উৎসারিত একই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি জাতীয় আয়, প্রবৃদ্ধির হার ও দারিদ্র-পরিমাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে অনেক সময় সংজ্ঞা ও পদ্ধতির কারণেও এরকম হয়ে থাকে। তবে এসবের সমন্বয় জরুরি। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য বিভ্রান্তি রয়েছে। বেকারত্বের ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব প্রকট। স্বাক্ষর-নিরক্ষর, গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, আঞ্চলিক, ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী পর্যায়ে বেকারত্ব ও আধাবেকারত্ব সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করে তার যথাযথ নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়। বেকারত্ব সম্বন্ধে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্যভিত্তি তৈরীও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৭। প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি ঘটছে অব্যাহতভাবে। তদুপরি আবহাওয়া পরিবর্তনের (climate change) ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ বাড়তি সংকটের সম্মুখীন হবে। উদাহরণস্বরূপ, অতিবৃষ্টির কারণে বন্যার প্রকোপ বাড়বে অর্থাৎ বড় বড় বন্যা আরো ঘন ঘন এবং দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে। পানি-বাহিত ও জীবানু-বাহিত রোগের প্রকোপ বাড়বে। ভূমির উর্বরতার উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। উপকুলীয় এলাকায় অনেক জমি বাস বা চাষের উপযুক্ত থাকবে না। পরিবেশ সংরক্ষণ সম্বন্ধে অনেক আন্তর্জাতিক প্রটোকল, কনভেনশন ও নীতিমালায় আমরা সই করেছি এবং দেশেও নীতিগ্রহণ করা হয়েছে এবং গবেষনা কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে না বরং তাতে অবনতি অব্যাহত। যেহেতু প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভিত কাজেই পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে এবং পরিবেশের উপর আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও যথাসময়ে বাস্তবায়ন জরুরি। এটি জাতির সামনে আরো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

উপর্যুক্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে বলিষ্ট পদক্ষেপ নিলে অন্যান্য অনেক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সমাধানের পথ সুগম হবে এবং টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। একই সাথে অংশীদারিত্বমূলক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত রচিত হবে। আর তাতে অর্থমন্ত্রীর যে উক্তি উদ্ধৃত করে এই প্রতিবেদন শুরু করা হয়েছে তার সার্থক প্রতিফলন ঘটবে।

তবে ঐ লক্ষ্যে বাজেটের আঙ্গিক ও নীতি কাঠামো নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। অবাধ বাজার অর্থনীতির কুপ্রভাবগুলো নিরসনে পদক্ষেপ চিহ্নিত করে

এগুলো প্রবর্তন করতে হবে অর্থাৎ বাস্তবতার আলোকে অর্থনৈতিক নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পুনঃসংস্কার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় শিল্প-ব্যবসা খাতসমূহকে বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে শুরু করতে হবে, কেননা তা জাতীয় আয়ে, দারিদ্র হ্রাসে এবং বৈষম্যহ্রাসে একই সঙ্গে অবদান রাখে । আগামী এক বছরে সরাসরি সরকারীভাবে এবং সরকার-দ্বারা অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে কতজনের কর্মসংস্থান করা যাবে তার প্রাক্কলন এবং কাদের জন্য এবং কোন কোন খাতে কি পরিমান কর্মসংস্থান হবে তা নির্দ্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি দারিদ্র হ্রাসেরও এরকম একটি প্রাক্কলন সময় ভিত্তিক দারিদ্রের প্রকারভেদ অনুসারে তৈরী করতে হবে। আর এ কাজ দুটো করতে হলে স্থানীয় পর্যায় থেকে পরিকল্পনা উঠে আসতে হবে। সেইকাজটি সুষ্টুভাবে করতে হলে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির পথ সুগম করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ।

বাজেট প্রনয়ণের এই আঙ্গিকে অন্যান্য মৌলিক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সমাধানের কথা একই ভাবে প্রথমেই নিয়ে আসতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: উপরে উল্লেখিত সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন, মানবদক্ষতার উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণ এবং তথ্য সংকট নিরসনের বিষয়।

এই পরিবর্তিত আঙ্গিকে উপর্যুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রম করার পথ ও পদক্ষেপ নিরূপনের পর ব্যয় বরাদ্দ বিন্যাস করতে হবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রাক-বাজেট মতবিনিময় সভায় (১৯ মে ২০০৫) বাংলাদেশের সরকারী বাজেটের কাঠামোগত রূপান্তর অবিলম্বে শুরু করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করে এবং সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু সুর্নিদিষ্ট প্রস্তাব রাখে। বিষয়গুলোর মধ্যে দুর্নীতিদমন; প্রশাসনিক স্বচ্ছতা; জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা; অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস; মানব দক্ষতা উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ); জন অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেকারত্ব এবং মানব-দারিদ্র ও বঞ্চনা দূরীকরণ; নারী উন্নয়ন; বিদ্যুৎ-সংকট নিরসন; পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; আর্থিকখাতের সংস্কার; বিশ্বায়ণ প্রক্রিয়া-উদ্ভুত সমস্যাসমূহ মোকাবেলার বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাজেটের এই আঙ্গিক-রূপান্তর

এবারের বাজেটে আদৌ ঘটেনি। ঘটার কথাও নয়। সেদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মানসিকতার যে পরিবর্তন দরকার তার প্রস্তুতি বর্তমান সমাজ বিন্যাসে ক্ষমতাবানদের মধ্যে অনুপস্থিত।

গতানুগতিকভাবে প্রস্তুতকৃত বাজেটের উপর গতানুগতিক কিছু মন্তব্য

১। এই পর্ব শুরু করা যাক অর্থমন্ত্রীর নতুন বাজেট বক্তৃতা থেকে আরো একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। বাজেট বক্তৃতার ৪২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "...২০০৫-২০০৬ সালের এই বাজেট প্রস্তাবনায় দেশের সকল স্তরের জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ বাজেটের সকল প্রস্তাবের ভিত্তি হচ্ছে জনগনের অংশীদারীত্বে প্রনীত দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র"।

প্রথমত দারিদ্রহ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়নে জনঅংশগ্রহণ প্রস্তাবে তা থাকলেও বাস্তবে তা ছিল খুবই সীমিত। এর কোনো বিষয়ে জনমত যাচাই-এর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে কিছু সেমিনার-ওয়ার্কশপ-এর আয়োজন করা হয়েছে বটে তবে এগুলোতে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী নন।

দ্বিতীয়ত বাজেট তৈরীতে কৌশলপত্র থেকে কিছু কিছু সুপারিশ নেওয়া হলেও ২০১৫ সালে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক দারিদ্রের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে (যার জন্য বছরে ৩.৩ শতাংশ হারে দারিদ্র কমিয়ে আনতে হবে) উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে বাজেটের আঙ্গিকে যে পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল (যে বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে) তা করা হয় নি। কাজেই অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্য শুধু কথার কথা বলেই দেখা যাচ্ছে।

২। কর্মসংস্থানকে দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যম হিসাবে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (পৃঃ ৬)। কিন্তু ১৮ পৃষ্টায় দেখা যায় যে, লক্ষ্যভিত্তিক দারিদ্র নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী বছরে ৪৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কোথায়, কার জন্য, কিভাবে, কত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে তার কোনো দিক নির্দেশনা নেই। দারিদ্র নিরসনের মূল হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত এই বিষয়টির কিছুটা বিস্তারিত প্রস্তাবনা বাজেটের বর্তমান আঙ্গিকেই করা যেত।

উক্ত বরাদ্দ ছাড়া অবশ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পল্লীকর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিল-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কিছু বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। ভাল কথা। তবে প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ-উদ্যোগ ঋণ গ্রহীতাদের জন্য কিছু সুবিধা

সৃষ্টি করলেও দীর্ঘমেয়াদে তাদের কর্মকান্ডগুলোর টেকসই সম্প্রসারনের সুযোগ ও প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ফলে দারিদ্রসীমার ধারে কাছেই এসকল মানুষ থাকে এবং বছরের পর বছর ধরে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ঋননির্ভর নিম্নমান জীবনযাত্রা ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর ক্ষুদ্রঋণ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে তারা আবার দরিদ্রদের কাতারে নেমে যেতে পারে। টেকসই দারিদ্রনিরসনের নিরিখে এই বিষয়ে সচেতনতা এবং ঋণগ্রহীতাদেরকে যথাসময়ে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত ও আধুনিকায়িত করার সুযোগ ও সহযোগিতা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা বাজেট বক্তৃতায় থাকা উচিত ছিল।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী সকল শিক্ষার ভিত্তি। তাই প্রাথমিক স্তরে যথাযথ মানসম্মত শিক্ষা-খুবই জরুরি। এবারের বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও এর গুনগত মানোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং একটি প্রকল্পে ৫০০০ কোটি টাকাসহ অন্যান্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে এই অর্থের ব্যয়-বিন্যাস দেখলেই কেবল বোঝা যাবে মানোন্নয়নে কি পরিমান খরচ করা হবে এবং কার্যকরভাবে মানোন্নয়ন করা যাবে কিনা। CAMPE–র এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ২ শতাংশের কম নির্ধারিত সব ধরনের দক্ষতা অর্জন করে থাকে। এই পর্যায় থেকে মানোন্নয়ন সহজ কাজ নয়। অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি ও স্কুল-ব্যবস্থাপনা কমিটি এ বিষয়ে এখনও তেমন কোন অবদান রাখে না। স্থানীয় শিক্ষা অফিসার দ্বারা কার্যকর তদারকি যে হয় না তা সর্বজনবিদিত। স্থানীয় পর্যায়ে তদারকীতে জনসম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের (যেমন, স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সেচ্ছাসেবি সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য) নেতৃবৃন্দ নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটি স্কুলে শিক্ষকরা ঠিকমত আসেন কি না বা পাঠদান করেন কি না, ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত স্কুলে আসে কি না এবং পড়াশুনা করে কি না, স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছেন কি না এবং শিক্ষা উপকরণ আছে কি না তা তদরকি করবে এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিবে। এরকম বা অন্য কোনো রকম কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করলে অর্থমন্ত্রীর আশাবাদ "অতি শীঘ্র দেশের শতভাগ শিশুকে গুনগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করতে পারব" অতিকথণই থেকে যাবে।

৪। কৃষি খাতে বেশ কিছু ইতিবাচক প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কৃষিখাতে বিদ্যুৎ ও সারসহ অন্যান্য উপকরণে মোট ভর্তুকি বর্তমান বছরের (৬০০ কোটি) তুলনায়

আগামী বছরে দ্বিগুন (১২০০ কোটি) করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৫ শতাংশ সুদে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পেও ২০ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ বিলের উপর ভর্তুকি দেওয়া হবে। ডেইরী ও পোল্ট্রী খাদ্যের কাঁচামাল, ঔষধ, চিকিৎসা উপকরণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত সকল শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষি আমাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড। তাই কৃষি-সহায়ক এসকল প্রস্তাব প্রশংসনীয়। প্রকৃত কৃষক কি যথাসময়ে কৃষি ঋণ পাবে? অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কৃষিখাতের সকল উপখাত (শস্য, মাছ, পশু, বন), তবে বিশেষ করে শস্য খাত (একই ফসল বার বার একই জমিতে চাষ এবং সারের অসমন্বিত ব্যবহারের কারণে) যা ক্রমাগতভবে জমির উর্বরতা সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে এবং বন্য-খরা ও আবহাওয়া পরিবর্তনে-খাপ খাওয়াতে যোগ্য ফসলের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণায় অনেক বেশি জোর দেওয়া উচিত ছিল। অন্যথায় কৃষিখাতে বিগত ৮/৯ বছরে অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখা যাবে না, আরো অর্জন আশাতিত। কৃষি গবেষণায় সুচিন্তিত বরাদ্দ না হলে ভবিষ্যতে উৎপাদন সমস্যা দেখা দেবে।

৫। দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতায় সকলেই উদ্বিগ্ন। দুর্নীতি দমন বিষয়ে শুধু বলা হয়েছে যে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কমিশনকে আর্থিক-প্রশাসনিক-আইনগত স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে কি না তা বলা হয়নি।

অপরদিকে কালো টাকা সাদা করার মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত অর্থ্যাৎ আরো এক বছর বাড়ানো হয়েছে। এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে দুর্নীতি উৎসাহিত হবে। এধরনের সুযোগ একবারই দেওয়া যেতে পারে এবং তা ৩০ জুন ২০০৫ তারিখে শেষ হবে। দেখা যাচ্ছে এই সিদ্ধান্তের পিছনে ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী চাপ ছিল। আর তাই কয়েকদিন আগে অর্থমন্ত্রী যে মত পোষন করতেন বলে জানা গিয়েছিল তা পাল্টিয়ে তার এই ১১তম বাজেটে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করলেন।

৬। স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যথাক্রমে ১২০ কোটি ও ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন দারিদ্র-হ্রাস সহায়ক। কাজেই স্থানীয় সরকারকে এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভুমিকা রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বশাসিত স্থানীয় সরকার নেই। স্থানীয়

সরকারগুলো বিরাজমান পরিস্থিতিতে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে। কাজেই এই অর্থায়ন তৃনমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী উদ্দেশ্যে হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

৭। ২০০৪-২০০৫-এর মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ থেকে ২০০৫-২০০৬ সালের জন্য প্রস্তাবিত অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩.২ এবং ১৩.১ শতাংশ বেশি। প্রতিরক্ষা খাতে দৃশ্যমান বরাদ্দ যথাক্রমে ৪.২ এবং ৯.৭ শতাংশ বেশি। আর তা ২০০৫-২০০৬ সালের জন্য প্রস্তাবিত অনুন্নয়ন ব্যয়ের ৯.৩ শতাংশ। এছাড়া অদৃশ্যমান আরো অনেক ব্যয় এই খাতে হয় যার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাক-বাজেট পরামর্শ হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রতিরক্ষা খাতসহ অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনতে হবে বা নিদেন পক্ষে চলতি বছরের বরাদ্দ থেকে টাকার অংকে না বাড়াতে প্রস্তাব রেখেছিল। সদিচ্ছা থাকলে অনুন্নয়ন ব্যয় উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব কেননা বাংলাদেশের মত একটি দেশে এত বড় এবং বিলাসাশক্ত বেসামরিক-সামরিক প্রশাসন প্রয়োজন নেই। প্রতিরক্ষা খাত সম্পর্কে সমিতি অন্য একটি প্রস্তাব রেখেছে যে, শিক্ষা ব্যবস্তার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'রিজার্ভ আমর্ড ফোর্সেস' গড়ে তোলার প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপন করা হোক, যাতে স্থায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রয়োজনে ঐ রিজার্ভ বাহিনীকে তলব করে যে কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধকে সার্বজনীনতা প্রদান করা যায়।

৮। দুর্নীতি, অপচয় এবং অনুন্নয়ন ব্যয় কমিয়ে বৈদেশিক ঋনের উপর নির্ভরতা কমানো এমনকি তা শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু সেদিকে অগ্রগতির কোন প্রস্তাব বাজেট বক্তৃতায় নেই। আগামী বছরে উন্নয়ন বাজেটের ৪৮ শতাংশ বৈদেশিক ঋন ও অনুদান থেকে আসবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০০৪ তারিখে অপরিশোধিত বৈদেশিক ঋণের পরিমান ছিল ১৮৫১ কোটি ডলার অর্থাৎ মাথাপিছু ১৩৪ ডলার বা ৮০০০ টাকা। বাংলাদেশে আজ যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করল, সে ৮০০০ টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পৃথিবীর মুখ দেখল। আর বৈদেশিক ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে।

বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে উন্নয়নের জন্য পাওয়া যাবে উন্নয়ন বাজেটের ২৪ শতাংশের মত। উন্নয়ন বাজেটে প্রস্তাবিত ৫২ শতাংশ অভ্যন্তরীণ যোগানের অর্ধেক অর্থাৎ মোট উন্নয়ন বাজেটের ২৮ শতাংশ আর তা আসবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থাৎ সঞ্চয়পত্র বা এ রকম অন্যান্য

ব্যবস্থায় জনসাধারণের কাছ থেকে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হবে। সরকারী ব্যাংকঋণ বাড়লে বেসরকারী খাতে ঋণপ্রবাহ সংকুচিত হতে পারে। আবার সরকার ঋণ নিয়ে অনুৎপাদনশীল (উন্নয়ন) খাতে ব্যয় করলে মূল্যস্ফীতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। আর এই বর্দ্ধিত অভ্যন্তরীণ ঋণ ও তার উপর প্রদেয় সুদের কারণে জনসাধারণের উপর অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝাও বাড়বে।

৯। অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৮ শতাংশ) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ-পরিশোধে ব্যয় যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ সুদ ১৪.৭ শতাংশ এবং বৈদেশিক সুদ ৩.৩ শতাংশ। ২০০৫-২০০৬ সালে প্রস্তাবিত সুদ পরিশোধ ২০০৪-২০০৫ সালের সংশোধিত বাজেটে সুদ-পরিশোধ থেকে ৮.৪ শতাংশ বেশি। অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এটি বেতন-ভাতার পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবং খাতওয়ারী বরাদ্দ বিভাজনে সর্বোচ্চ বরাদ্দ যার পেছনে ১৬.৩ শতাংশ নিয়ে রয়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি। যদি ঋণ কম নেওয়া হত তবে প্রদেয় সুদ কম হবে এবং আদয়কৃত রাজস্ব থেকে আরো বেশি অর্থ উন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তর করা যেত। বৈদেশিক ঋণ তো বটেই অভ্যন্তরীণ ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সর্তকতা অবলম্বন জরুরী। প্রশাসনিক খরচ কমিয়ে এবং অপচয় রোধ করে ঋণ নেওয়ার পরিমান কমালে ভবিষ্যতে সুদ-পরিশোধের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। সতর্কীকরণ হিসেবে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।

১০। রাজস্ব আদায়ে এবং উন্নয়ন-বরাদ্দ ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি এবার এবং আগের বছরগুলোতে থাকা সত্ত্বেও আগামী বছরে রাজস্ব-আয় ও উন্নয়ন-ব্যয় এবারের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় যথাক্রমে ১৯.৫ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আমরা কিছুটা উচ্চাভিলাষের পক্ষে তবে তা বাস্তবিবর্জিত আকাশকুসুম কল্পনা-রূপে হলে সমর্থনযোগ্য নয়। তাই অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সহজেই বলা যায় যে, এক বছরের মধ্যেই কর-আদায় ব্যবস্থা ও উন্নয়ন-প্রশাসনের দক্ষতা প্রয়োজনানুসারে বাড়া সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত রাজস্ব-আয় ও উন্নয়ন-ব্যয়ের অনেকাংশ অবাস্তবায়িত থেকে যাবে। বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানও প্রস্তাব অনুযায়ী এত পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

এই বাস্তবতা জেনে-শুনে অবাস্তব প্রস্তাব কেন করা হল। সম্ভবত নির্বাচনী বিবেচনা কাজ করেছে এই এরকম বড় আকারের বাজেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে। আর তাই যদি হয়, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে ব্যয় বিন্যাসে যে অগ্রাধিকার হওয়া উচিত তা বাধাগ্রস্থ হবে এবং নির্বাচনে সহায়ক হবে এমন প্রকল্প ও অঞ্চলসমূহে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারনের প্রবনতা কাজ

করবে। বিরাজমান অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি, যোগসাজস এবং দুর্নীতির কারণে এ রকমটি সহজেই ঘটতে পারে।

১১। বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ সম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছুটা বাড়লেও তা চলতি বছরে জাতীয় আয়ের এক শতাংশের কম। অতিসম্প্রতি বিভিন্ন দেশের বড় বড় কোম্পানী বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। এর পরিমান ১২০০ কোটি মার্কিন ডলার বলে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী কোনো কোম্পানীর সাথে আলোচনা দুই পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন হলে বিনিয়োগ বাস্তবে ঘটবে। অতীতে এরকম বড় বড় প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। তাই যদিও আশা রাখা যায় যে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আগামীতে বাড়বে তবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে না এখনই। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সঙ্গত কারণেই মুনাফা অর্জন করতে পারলেই বিনিয়োগ করবে। আর আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে দ্রুত দারিদ্রহ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ আমাদের জাতীয় মূল লক্ষ্যসমূহে যাতে অগ্রগতি হয় এবং কোন অবস্থায় যেন কোনো একটি মূল লক্ষ্য বিঘ্নিত না হয় সেদিকে। অন্যথায় প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক বিনিয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। বেসরকারী ঋণ-প্রবাহ এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়ার কারণে (যার ফলে গত বছর ৩৬০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়েছে শুধু মাত্র জ্বালানি তেল আমদানিতে) দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে বলে বাজেট বক্তৃতায় বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে এবং কৃষিখাতসহ অন্যান্য খাতে প্রবৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায় নেমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

বছরওয়ারী বিচারে গত মার্চ মাসে সরকারী হিসাবে মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.১৮ শতাংশ। পরবর্তীতে এতে উর্দ্ধগতি অব্যাহত। প্রকৃত মূল্যস্ফীতি সরকারী হিসাব থেকে বেশি হতে পারে কেন না খাদ্যদ্রব্যাদিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বেড়েই চলেছে। আগামী বছরে বাজেটে প্রস্তাবিত অনুন্নয়ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যাংকঋণ নিয়ে অনুৎপাদশীল বিভিন্ন সরকারী ব্যয় মেটানো, নির্বাচনী বিবেচনায় সম্ভাব্য অনুৎপাদশীল ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আগামী বছরে মূলস্ফীতি আরো বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ে দেশে ব্যাপক উদ্বিগ্নতা বিরাজমান। এ ক্ষেত্রে শুধু আশা প্রকাশ করা ছাড়া কিছু পদক্ষেপের প্রস্তাব প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বাজেট বক্তৃতায় তা রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত।

১৩। সার্বিক কর বা শুল্ক কাঠামোয় তেমন কোন পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি। কিছু সুষমকরণ ও কিছু সমন্বয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে আদায় কতটুকু করা যাবে-এ মর্মে অর্থমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, আদায় বাড়বে। দুর্নীতি ও অদক্ষতার বেড়াজাল ভেদ করে তার আশাবাদ কতদূর যায় তা সময়ে দেখা যাবে।

১৪। ম্যাক্রো-অর্থনীতিতে কয়েকটি টানাপোড়েন বিদ্যমান। চলতি বছরে প্রথম ৯ মাস বেসরকারীখাতে ঋণ (১২.৭%) এবং আমদানি (২৬.০%) দ্রুত বেড়েছে। রপ্তানি বেড়েছে ১২.৫ শতাংশ কাজেই ব্যাংকের তারল্যের উপর বিরূপ প্রভাব এবং বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির ফলে মাক্রো-স্থিতিশীলতার টানাপোড়েন বেড়েছে। আর রয়েছে মূদ্রাস্ফীতির উর্দ্ধগতি। এই প্রবনতাগুলো সর্তক বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। ম্যাক্রো-মাইক্রো সহযোগ জোরদার করার প্রয়াস নিতে হবে যাতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রেসমূহে দেশজ উৎপাদন প্রত্যাশিতভাবে বাড়ে।

১৫। কর অবকাশ-মেয়াদ কয়েকটি শিল্প খাতের জন্য আরো তিন বছর বাড়ানো হয়েছে। প্রতিযোগিমূলক বাজার ও বিশ্বায়নের যুগে এই পদক্ষেপ শিল্পায়ন সহায়ক বলে আমরা মনে করি। তবে যথাযথ তদারকির মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে যেন অতীতের মত এই সুযোগের অপব্যবহার করা না হয়।

২০০৬-০৭ বাজেট ঘোষণা উত্তর সংবাদ সম্মেলন

বাজেট ২০০৬-০৭: উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই গলদ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
অধ্যাপক আবুল বারকাত **

ভূমিকা

বাস্তবতার আলোকে বাজেট প্রণয়নে তার সদিচ্ছার কথা বর্তমান অর্থমন্ত্রী বিগত বছরগুলোতে অনেকবার ব্যক্ত করেছেন। তবে তা নানামুখী চাপ ও গৃহীত অর্থনৈতিক দর্শনের কারণে অতীতে তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি, এবারও না। অবশ্য এধরনের একটি গতানুগতিক বাজেটে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবধর্মী ও প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ ও আর্থিক বরাদ্দ থাকতে পারে, থাকে। কিন্তু গতানুগতিকার উর্ধ্বে উঠে দেশের মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানে এবং মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাজেট কতটা অবদান রাখবে তা বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলতঃ আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

এই প্রেক্ষিতে প্রথমেই উন্নয়নদর্শনের বিষয় সামনে চলে আসে। এই বিশ্বায়নের যুগে বাজার অর্থনীতির রথে সারা বিশ্ব আজ সহযাত্রী। এই রথ বিশ্বসম্পদ, বিশ্ববাণিজ্য, এবং পারস্পারিক বিশ্ব-নির্ভরতাকে নিয়ে গেছে এক অভূতপূর্ব চূড়ায়। কিন্তু বিশ্ব দারিদ্র্য থেকে গেছে ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আয়োজনে জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা : ১২ জুন, ২০০৬

সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায়ে টেকসই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত। শুধু তা-ই নয় প্রচলিত অন্যায্য এই বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বের দিকে দিকে জন্ম নিচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে প্রতিবাদী আবহ, কণ্ঠস্বর, আন্দোলন এমনকি জঙ্গি তৎপরতা।

নব্য-উদারতাবাদ যা প্রচলিত এই বিশ্বব্যবস্থার মূল দর্শন তা আজ ব্যাপকভাবে সমালোচিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তার ১৯৯২ সালে প্রকাশিত ৎঞযব উহফ ড়ভ ঐরংঃড়ৎু ধহফ ঞযব খধংঃ গধহচ বই-এ লিখেছিলেন নব্য-উদারতাবাদই এখন চিরদিনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অন্য কোনো ব্যবস্থা একে কোনো দিন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে হঠাতে পারবে না। তিনিও এখন এই ব্যবস্থার কড়া সমালোচক। এই ব্যবস্থায় বিশ্বের নেতৃত্ব ও সকল ক্ষমতা ও বিশ্বসম্পদের সিংহভাগ থাকছে উন্নত বিশ্বের হাতে আর জাতীয় পর্যায়ে একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাধর (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক, ও সামাজিক) শ্রেণীর হাতে থাকছে রাষ্ট্রের এবং অর্থনীতির সর্বময় কর্তৃত্ব। চীনের দিকে তাকালে দেখা যায় বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করার ফলে বিগত অনেক বছর ধরে সেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে খুবই দ্রুত। এই প্রক্রিয়ায় হয়তো আগামী ১৫-২০ বছরে চীন পৃথিবীর এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু দারিদ্র্য ও বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে এবং দ্রুত বেড়ে চলেছে। যদি এর লাগাম টেনে ধরে দ্রুত বিপরিতমুখী প্রক্রিয়া চালু করা না যায় তবে চীন এক নতুন বিপ্লবের সম্মুখীন হবে বলে অনেকের আশংকা। চীনের বর্তমান নেতৃত্বও শংকিত। তাই তারা এই বছর মার্চে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশনে "নতুন সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা" উপস্থাপন করে এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক গ্রাম গড়ে তোলার কথা বলছে।

বাংলাদেশও বিশ্বায়নের রথযাত্রায় এক অঙ্গীকারাবদ্ধ সহযাত্রী। বাংলাদেশ চীনের মত দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি, তবে দেশে বিরাজমান দারিদ্র্য প্রকট থেকেছে এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য অত্যন্ত উঁচুমাত্রায় পৌছে গেছে এবং দ্রুত বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে দরিদ্রতম পাঁচ শতাংশের আয় থেকে সবচেয়ে ধনী পাঁচ শতাংশের আয় ২০০০ সালে ছিল ৪৬ গুন কিন্তু তা দ্রুত বেড়ে ২০০৫ সালে ৮৪ গুনে উন্নীত হয়েছে। এই যাত্রাপথ টেকসই নয়। দারিদ্র্য-বঞ্চনায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, জর্জরিত। দেশের দিকে দিকে (কানসাট, শনির আখড়া, তৈরীপোশাক শিল্পের শ্রমিক আন্দোলন) ক্রমবর্দ্ধমান বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। বিরাজমান বৈষম্যবর্ধক প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সংঘাত বাড়বে বই কমবে না। তাই উন্নয়নদর্শনে শুধু বক্তৃতায় নয় কার্যকর সংস্কার জরুরী। আর তার মূল মন্ত্র হবে বিরাজমান ও বিকাশমান অ-টেকসই বাস্তবতার বিপরীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের দায়দায়িত্ব নির্ধারনপূর্বক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সরকারের সকল কর্মকান্ডে বৈষম্য-নিরসনমূখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হতে হবে। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটিয়ে সরকারী সেবা সাধারন মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তথা সামাজিক বিবর্তনের সকল প্রক্রিয়ায় জন-অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তণ করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষকে বসাতে হবে, আর মানব-উন্নয়নই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়। এসবই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থার বলিষ্ট ভূমিকা রেখেই করা সম্ভব। প্রয়োজন যথাযথ সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের আওতায় ন্যায়নীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে বেসরকারী খাতের বিকাশে সরকারি তদারকি আওতায় নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বেসরকারী খাতের বিকাশে সহায়তা ও উৎসাহদানকারী আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরী করা।

নব্য উদারতাবাদের নিরংকুশ অনুসরনের কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থাও তাই জনকল্যাণ-বিরোধী। সরকারী নীতি ও বক্তব্যে দারিদ্র্য নিরসন ও জনকল্যাণ স্বীকৃত হলেও সরকারী কর্মকান্ড ক্ষমতাকাঠামোর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন আশ্রিত। একটি দুর্নীতিদমন কমিশন গঠন করা হলেও একে অকার্য্যকর করে রাখা হয়েছে। এর আর্থিক প্রশাসনিক কোন স্বাধীনতা শুরু থেকেই নেই। সম্প্রতি কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ভিন্ন আঙ্গিকের একটি ছোট আকারের জনবলকাঠামো এর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অকার্য্যকর ছিলই এখন একে ঠুটো জগন্নাথ বানানো হল। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশনার দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও এবং অনেকবার সময় নেয়ার পর সুপ্রিমকোর্ট আর সময় দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পরও বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয় নি। দেশে আইনের শাসনের দারুন অভাব। এছাড়া স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতারও দারুন অভাব। অর্থাৎ দেশে সুশাসনের অনুপস্থিতি প্রকট।

এই ব্যবস্থায় জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়ন সম্ভব নয়। আর কিছু কিছু বরাদ্দ পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন গোষ্ঠির উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হলেও তার সিংহভাগ মধ্যসত্ত্বভোগীরা হাতিয়ে নেয়। উদ্দিষ্ট মানুষের কাছে পৌঁছে সামান্যই। অধিকাংশ সময়ে তারা জানেনই না বাজেটে কি বরাদ্দ আছে তাদের জন্য।

জনকল্যাণধর্মী জনঅংশীদারিত্বভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন তথা উন্নয়নপ্রক্রিয়া প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাই উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। যতদিন না তা ঘটে ততদিন গতানুগতিক বাজেট তৈরী হতে থাকবে এবং গতানুগতিকভাবে তা খন্ডিত আকারে এবং মূলত কিছু ক্ষমতাধর মানুষের স্বার্থে বাস্তবায়িত হবে। আর বিশাল পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠি উপেক্ষিতই থেকে যাবে। ফলে দেশ এগিয়ে চলবে অ-টেকসই পথে সংঘাতময় ভবিষ্যতের দিকে।

এ বাজেট জনগণের কল্যাণে আসবে না

সংকট স্বীকার করা হয়নি- উত্তরণ সুদূর পরাহত: পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে প্রতিবছর বাজেট দিতে হয় বলে দেয়া হয় এবং সেটি নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রাক-পর বিশ্লেষণ করলেও সে বিষয়ে কর্ণপাত করা হয় না। এমনিতেই আমাদের পুরো বাজেট প্রক্রিয়াটিই ভীষণ মাত্রায় অস্বচ্ছ। নেই জবাবদিহিতার কোনরকম ব্যবস্থা। জনপ্রতিনিধিদের বাজেট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ অনুপস্থিত বললেই চলে। বাজেট হয়ে উঠেছে নিছক একটি 'হিসাবরক্ষণ দলিল', দেশ-নির্দেশনা দেবার মত কিছুই এতে পাওয়া যায় না। দেশের নানা ধরণের প্রকৃত সংকট স্বীকার করা হয় না আদৌ, অথবা সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয় কিংবা সংকটের মাত্রাকে করা হয় ক্ষুদ্রতর। এবারের বাজেটেও দেশের প্রধান সমস্যা– দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দূর্নীতি, বিদ্যুত ঘাটতি, বিনিময় হার ইত্যাদি– জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো সামনে না এনে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আর যেহেতু ঠিকমত স্বীকারই করা হয়নি সেহেতু সংশ্লিষ্ট এসবে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার অনুপস্থিতি স্বাভাবিক, যা থেকে মনে করা যেতেই পারে যে এসব বিষয়ে সরকার দুশ্চিন্তিত নন।

নৈতিকতা বর্জিত বিশালাকৃতির বাজেট: এবারের বাজেট অতীতের বাজেটের তুলনায় অনেক বড় আকৃতির। এবারে বাজেট করা হয়েছে ৬৯ হাজার ৭ শত ৪০ কোটি টাকার। গতবারের সংশোধিত বাজেটের ঘাটতি মূল বাজেটের চেয়ে ৩,৩২৫ কোটি টাকা। আর এবারের বাজেট গতবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৮ হাজার ৬ শত ৮২ কোটি টাকার বেশি। গতবারের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হলে এ বৃদ্ধি পেশাদারী অথবা নৈতিক কোন বিবেচনা থেকেই যুক্তিসঙ্গত নয়। গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার বেশি এ বাজেট এক অসম্ভব প্রস্তাবনা এ জন্যও যে অর্থমন্ত্রী ইতোমধ্যে স্বীকার করেছেন (বাজেটের আগে বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে) যে দেশে সংকট চলছে (এবং এবারের বাজেট তার জন্য মহা-চ্যালেঞ্জ): আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মুল্য বৃদ্ধিজনিত সংকট, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সংকট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট, সরকার পরিচালনে ব্যাংকের উপর অতি-নির্ভরতার সংকট, বিদ্যুত সংকট, মুদ্রাস্ফীতির সংকট, এমনকি দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন কাজ ব্যহত হবার সংকট (অবশ্য সন্ত্রাস-মূল্যবৃদ্ধি সংকট এড়িয়ে গেছেন)। তাছাড়া বর্তমান সরকার এই বাজেট নিয়ে কাজ করবে চার মাস, তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে তিন মাসের জন্য। এরপর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার অর্থবছরের বাকী ৫ মাস দেশ চালাবে। এমতাবস্থায় তারা কতটা সফল হবে সেখানে প্রশ্ন রয়ে যায়।

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে পারেনা। মোট বরাদ্দের ৩০-৪০ ভাগ খরচ করে ৯ মাস ধরে। আর

তড়িঘরি মাত্র ৩ মাসে খরচ করার চেষ্টা করা হয় বাদ বাকি ৬০-৭০ ভাগ। এই খরচ হয় কেবল ভাউচারপত্র তৈরীর মাধ্যমে। এ সবই এখন নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছে– এসবই সরকারী অব্যবস্থাপনা ও সরকার-পরিতোষিত দুর্নীতির স্পষ্ট নির্দেশক।

বাজেটে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে আয়ের মূল উৎস রাজস্বখাত এবং রাজস্ব বহির্ভূতখাত। এবারে বাজেট ঘাটতি ১৭,১৯৮ কোটি টাকা। এই অর্থ সংস্থানের দু'টি উৎস। একটি হচ্ছে বিদেশী ঋণ ও অনুদান । সেখান থেকে এবার ১১ হাজার ৩ শত ১৮ কোটি টাকা ঋণ-অনুদান হিসেবে সংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে। এই অর্থ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন বাজেটের শতকরা ৪৩ শতাংশ যা বড় মাপের বিদেশ নির্ভরতা নির্দেশ করে। অপরদিকে ১৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রম, উন্নয়ন, উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হবে। একই সঙ্গে ব্যক্তি ঋণখেলাপীর পাশাপাশি সরকারের ঋণখেলাপী হবার প্রবণতা বাড়বে। এবারে বাজেটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় হচ্ছে সুদ পরিশাধ। আর জ্বালানী তেলের ভর্তুকি মেটাতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অনুকুলে যে বিপুল অংকের ব্যাংক ঋণ দিতে হচ্ছে তা এখন থামবেনা, বিধায় সরকারি খাতের ব্যাংক ঋণ বেড়ে গেলে বেসরকারিখাতের ঋণ আরো সঙ্কুচিত করতে হবে, নতুবা মূল্যস্ফীতির উপর বাড়তি চাপ পড়বে যার কোনটিই কাম্য নয়। দাতা সংস্থাগুলোর শর্তপূরণের উপর নির্ভর করছে বৈদেশিক সাহায্য পাবার সম্ভাবনা–সেখানেও অনিশ্চয়তা আছে। সুতরাং বিশালাকার-বাস্তবতা বর্জিত এই বাজেট পেশাদারী বিবেচনা থেকে করা হয়নি। সম্ভবত, প্রধান বিবেচনা আগামী নির্বাচন। আর সেজন্যেই পেশাদারী মনোভাবের বিপরীতে সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনাটিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

এডিপি–দুর্নীতি সহায়ক: ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে এডিপিতে যে ২৬ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে গত অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির চেয়ে তা ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বেশি। পাশাপাশি রাজস্ব আদায়েও লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাস্তবায়নে সময় বেশি লাগে এমন প্রকল্প যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি প্রকল্পে বরাদ্দ তেমন বাড়েনি, বরঞ্চ দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় এমন উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ শুভ লক্ষণ নয়। এমনকি প্রস্তাবিত এডিপিতে প্রকল্প সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, ৪২৮টি এমন প্রকল্পও নেয়া হয়েছে যাদের বিপরীতে কোনও বরাদ্দই নেই। গত অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার যেখানে মাত্র ৪৫ শতাংশ সেখানে এত বড় এবং এত সংখ্যক প্রকল্প সমৃদ্ধ এডিপি আমাদের নেতিবাচক ভাবনা ভাবতে বাধ্য করে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কোনো রকম শিক্ষা না নিয়ে এবং জাতীয় সংকট স্বীকার না করে এত বৃহৎ আকারের এডিপিকে আমরা 'দুর্নীতি সহায়ক এডিপি' বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বরাদ্দ এবং সংশোধিত বরাদ্দ–কোথায়, কেন?: আমাদের অর্থনীতির মেরুদন্ড কৃষি। অথচ গত অর্থবছরে কৃষি খাতে বরাদ্দ ৪৭২৯ কোটি টাকা সংশোধিত হয়ে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪৯৪ কোটি টাকা। এ অবস্থায় এবারকার বরাদ্দ ৫৮০৬ কোটি টাকা সংশোধিত হয়ে কততে দাঁড়ায় সেটিই বিবেচ্য। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগে গত অর্থবছরের বরাদ্দ ছিলো ৬৩৮৩। সংশোধনের পর সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫০৩ কোটি টাকা। এবারকার বরাদ্দ আরও বেড়ে হয়েছে ৬৭৯৫ কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধি আপাত:দৃষ্টিতে ইতিবাচক মনে হলেও এই ব্যয় কোথায়, কিভাবে হচ্ছে তা জানলে শঙ্কিত হতে হয়। গত বছরের বরাদ্দ সংশোধিত হয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও সত্য। এবছর এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে আরও। এমনিতেই এখাতে বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, তার ওপরে এতে যোগ হয় 'অদেখা উন্নয়ন ব্যয়'ও। অনুৎপাদনশীল এই খাতে এবারকার দৃশ্যমান ৪৯০৪ কোটি টাকা বরাবরের মতোই বেশি, যা সংশোধিত হয়ে আরও বাড়বার শঙ্কা রয়েছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে গতবছরের বরাদ্দ ৯৬৮৬ কোটি টাকা সংশোধনের ফলে কমে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো ৯২৬৫ কোটি টাকা, সেখানে এবারকার বরাদ্দ ১১,০৯৩ কোটি টাকার বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব কে জানে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে এবার বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু গতবছরের বরাদ্দ সংশোধিত হয়ে যখন কমে গিয়েছিল, তেমন অবস্থায় এবারকার বাড়তি বরাদ্দও হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়কে একত্রিত করে বাজেটে বলা হলেও দেখা গেছে গত অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সংশোধিত বাজেট হ্রাস পেয়েছিল, আর সংশোধিত হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ধর্ম মন্ত্রাণালয়-এর বরাদ্দ। জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ গত অর্থবছরে বরাদ্দ পেয়েছিল ১০২১ কোটি টাকা যা সংশোধিত হয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩৭১ কোটি টাকা। অথচ গ্যাস-কয়লা উত্তোলন নিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হতে লজ্জা নেই আমাদের। আর বিদ্যুৎ বিভাগের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি হলেও সারাবছর ধরে বিদ্যমান ছিল বিদ্যুৎ সংকট। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২৫৪ কোটি টাকা সংশোধিত হয়ে যেখানে দাঁড়ায় মাত্র ১৬৬ কোটি টাকায় সেখানে এবারকার ৩৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের যুক্তি কি?

বরাদ্দ এবং সংশোধনের এই হেরফেরগুলো কেন? এগুলো কি নিছক বাজেট তৈরির ভুল? ভুল হলে তার ব্যাখ্যা এবারে অনুপস্থিত কেন? না'কি অন্য কিছু?

ব্যয় বাড়ছে–কোথায়, কেন?: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে উন্নয়ন ব্যয় কমেছে প্রায় ২৫ শতাংশ, অথচ অনুন্নয়ন ব্যয় বেড়েছে ২৫ শতাংশ। মঙ্গা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট ভাবনাও অনুপস্থিত। যোগাযোগ খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন দুই ক্ষেত্রেই ব্যয় বাড়ছে যথাক্রমে ২১.৭ শতাংশ ও ১৭.৬ শতাংশ কিন্তু পল্লী অবকাঠামো যখন এর বাইরে

তখন পল্লী যোগাযোগের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? পরিবেশ মন্ত্রণালয়েরও উন্নয়ন ব্যয় কমেছে, বেড়েছে অনুন্নয়ন ব্যয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বেহাল দশা এবং দুর্নীতির কথা সুবিদিত হলেও এই মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ বেড়েছে তিনগুন। পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি নগন্য। অর্থবিভাগে অনুন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে প্রায় ৭৮ শতাংশ। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে অনুন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে বৃহৎ ও এস ডি'র কারণে। গত অর্থবছরে র‍্যাব, চিতা ইত্যাদি নানান বাহিনীর কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। এবারও বরাদ্দ বেড়েছে ৭.৬ শতাংশ। অথচ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি তো ঘটেইনি, ঘটেছে অবনতি।

থোক বরাদ্দ-সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টঃ জোট সরকারের বিগত বাজেটগুলোতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ব্যয় ও খাতওয়ারী থোক হিসেবে বিরাট অংকের থোক প্রতিবছর বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়। জনগণের উন্নয়নে এসব অর্থ বরাদ্দ রাখার যৌক্তিকতা দেখানো হলেও এর সিংহভাগ ব্যয় হয় সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তারপরও প্রতিবছর রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বাজেটে থোক বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। এবছরও বিশাল অংকের থোক বরাদ্দ দেখা গেলো বাজেটে। আড়াই হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী শুধু নয়, বরঞ্চ উদ্দেশ্য উল্লেখ ছাড়া এহেন থোক বরাদ্দ সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘনও বটে। আর আসলে থোক বরাদ্দের পরিমাণ যে কত তা আদৌ স্বচ্ছ নয়।

বৈষম্য বাড়বেইঃ ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেট বিভিন্নভাবে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বৃদ্ধির সহায়ক হবে।বাজেটে "কালো টাকা সাদা করার সহজ কৌশল" রাখা হয়নি সত্যি, কিন্তু তার বদলে কিছু বেশি কর দিয়ে দামি ফ্ল্যাট, জমি বা গাড়ি কেনবার পদ্ধতিটির কারণে আবারও বৈষম্যের স্বীকার হবে সাধারণ মানুষ। প্রবল মুল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় যেখানে নিম্নমুখী সেখানে করযোগ্য আয়ের সিলিং তো বাড়ানো হয়ইনি, বরঞ্চ ধনীদের আয় করে রেয়াত দেয়ার বিধান করা হয়েছে। যাদের বার্ষিক আয় ১০ লক্ষ টাকা তাদের দিতে হতো ২৫ শতাংশ হারে কর। কিন্তু এবছর যদি তারা তাদের আয় মাত্র ১০ শতাংশ বেশি অর্থাৎ ১১ লাখ দেখান তাহলে তারা ১০ শতাংশ কর রেয়াত পাবেন। আয়কর ধারা ১৯ অব্যাহত রেখে বর্ধিত কর প্রদান করে জমি, বাড়ি, গাড়ির মালিক হবার সুযোগ নিতে পারবে ধনী এবং কালো টাকার মালিকেরাই, আর সাধারণ মানুষের জন্য সম্পদের মালিকানা লাভ হয়ে উঠবে কঠিন থেকে কঠিনতর। উপরন্তু লাভ বা ক্ষতি যাই হোক ছোট প্রতিষ্ঠানের ওপর বাধ্যতামূলক ৫ হাজার টাকা আয়কর প্রদানের বাজেট প্রস্তাব বৈষম্য বৃদ্ধি করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্লথ হার, শিল্পায়ন ত্বরান্বিত না

করা, কৃষি উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টির অনুপ্রেরণাহীনতা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিদ্যুৎ সুবিধে হ্রাস, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবন মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথেষ্ট বরাদ্দ না থাকাসহ ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি-সন্ত্রাস (মূল্য সন্ত্রাসসহ)– এ সবই দেশে অধিকহারে বৈষম্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করবে।

করের বোঝা–জনগণের ঘাড়ে: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ৬ ভাগ থেকে কমিয়ে ৫ ভাগ করলেও কাঁচামাল, আধা-প্রক্রিয়াজাত কাঁচামাল এবং ফিনিসড প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১২ ও ২৫ ভাগ শুল্ক রয়েই গেছে। সম্পূরক শুল্ক ও শুল্ক হারে তেমন হেরফের হয়নি বিধায় বাজেট অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের চাহিদা বাড়বে এবং এতে ভ্যাটের আওতা বাড়বে। ফলে বিপদে পড়বেন সাধারণ ক্রেতারাই। রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর আয় ৪১ হাজার ৫৫ কোটি টাকা। এরমধ্যে পরোক্ষ করের প্রভাবে ক্রেতার ওপর শতকরা ৭৮ ভাগ চাপ পড়বে। তাছাড়া, কর বহির্ভূতসহ মোট রাজস্ব আয় ৫২ হাজার ৫ শ' ৪২ কোটি টাকা। এতে সরাসরি ক্রেতার ওপর শতকরা ৬৩ ভাগ চাপ পড়বে। তাছাড়া ছোট প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন ৫ হাজার টাকা আয়কর তাকে গুনতেই হবে। অর্থাৎ, ঘুরে-ফিরে করের বোঝাটা গিয়ে চাপছে সাধারণ জনগণের ঘাড়েই।

এ বারের বাজেট অনুযায়ী চার স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো বহাল থাকছে। অপরিবর্তিত থাকছে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ শুল্কহার। কমছে মধ্যবর্তী ও নিম্ন শুল্কহার। ফলে দেশীয় শিল্পের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বার আশঙ্কাটা রয়েই গেলো।

দ্রব্যমূল্য–বাড়তে বাধ্য: এবারের বাজেটে আমদানি পর্যায়ে শুল্কহার কমিয়ে আদা, রসুন, হলুদ, মরিচ, ছোলা ইত্যাদি নানান নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের শুল্কহার কমানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রী এর ফলে দাম খানিকটা কমবে মনে করলেও তিনি এও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে অতি মুনাফার প্রলোভন, দুর্নীতি, পদে পদে চাঁদাবাজি ইত্যাদি পরিহার না করলে এবং মজুদ ব্যবস্থাপনা ও সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক তত্ত্বাবধানের উন্নয়ন করতে না পারলে শুল্ক হ্রাসে তেমন কোন ফলপ্রসু অবদান রাখা যাবে না। অতএব শুল্ক হ্রাস কোন সমাধান নয়, সুশাসন প্রতিষ্ঠাই মূল কথা। এটি এখন পরিস্কার যে শুল্ক হার হ্রাস দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট প্রবঞ্চনা মাত্র; এক্ষেত্রে শুল্ক হার নিয়ে যা বলা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে মোটেও সহায়ক হবে না। কারণ শুল্ক হার কমলেও এখন আর ভোক্তা স্তরে দ্রব্যমূল্য কমে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট। বরঞ্চ এমনও হতে পারে যে শুল্কহার হ্রাস আমদানি খরচ কমিয়ে দেবে এবং লাভবান হবে মজুতদার আমদানিকারক। তাছাড়া তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে বাড়বে পরিবহন ব্যয়, ফলশ্রুতিতে বাড়বে নিত্য ব্যবহার্য পন্যের দাম। বাজার পরিদর্শন করে এমন সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যেমন বাজেটে রসুনের আমদানি শুল্ক

কমানোর প্রস্তাব থাকলেও বাজেট ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আমদানিকৃত রসুনের দাম একলাফে ৪০ শতাংশ বেড়েছে। বাজেটে দাম বাড়তে পারে এমন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে অনেক আমদানিকারক রসুনসহ আরও বিভিন্ন পন্য মজুদ করে রেখেছিলেন। রসুনের শুল্ক হ্রাস করায় মজুদদাররা হঠাৎ করে সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিমত। সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য বাড়তেই থাকবে। কারণ ১. মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট অত্যন্ত সংগঠিত, ২. সম্পূরক শুল্ক বহাল থাকবে, ৩. ঘাটতি বাজেট মেটাতে অভ্যন্তরীণ ঋণ বাড়বে যার বোঝা চাপবে জনগণের ঘাড়ে।

দারিদ্র বিমোচন–বুলিসর্বস্বঃ সরকারী ভাষ্যে বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতিই বর্তমানে চালিত হচ্ছে 'দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র'-এর ভিত্তিতে। দারিদ্র বিমোচন সেক্ষেত্রে আমাদের বাজেটে প্রাধান্য পাবে সেটাই স্বাভাবিক। প্রাধান্য যা পেয়েছে তা নিতান্তই 'শ্লোগানমূলক'। দারিদ্রের বহুমুখী স্বরুপ, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বর্তমান সংখ্যা এবং প্রক্ষেপিত সংখ্যা বলা হয়নি বাজেটের কোথাও। কোথাও বলা হয়নি কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কত সময়ের মধ্যে কতটুকু দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূর হবে এবং কল্যাণ নিশ্চিত হবে । সময়ভিত্তিক কোন প্রক্ষেপণ তো একেবারেই অনুপস্থিত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক দারিদ্রের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হলে আগামী দশ বছর সময়ে বছরে ৪.৫ শতাংশ হারে দারিদ্র কমিয়ে আনতে হবে। অথচ আমাদের দেশে বর্তমান প্রবৃদ্ধি সরকারী হিসেবে ৬.৭ শতাংশে উন্নীত হলেও (যা বিশ্বাসযোগ্য নয়), বিগত ৪ বছরে দারিদ্র কমেছে বছরে মাত্র ১.৬ শতাংশ হারে। এভাবে দারিদ্র কমতে থাকলে সংবিধানে বিধৃত মৌলিক চাহিদার নিরিখে দারিদ্র দূর কবে হবে তা কেউই জানে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশে উন্নয়ন সূচক গুলোর সার্বিক যে বেহাল অবস্থা তাতে দারিদ্র হ্রাসের বিষয় হবে সুদুরপরাহত। এমতাবস্থায় বাজেটে দারিদ্র হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়াদি যথেষ্ট মাত্রায় বুলিসর্বস্ব।

কর্মসংস্থান–তেমন বাড়বে নাঃ বলা হয়েছে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর কর্মসংস্থান যেখানে দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম কৌশল সেখানে বাজেটে এ বিষয়ে সংবিধানিক বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ হিসেবপত্তর থাকা প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে ২০-২৫ লক্ষ মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে তার মধ্যে অধিকাংশ মানুষের কর্মসংস্থান হয় না। এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ বরাদ্দের কথা বলা হলেও সেভাবে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেকারত্ব সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর কোন দিকনির্দেশনা বাজেটে নেই। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাঠামোগত কোন বিন্যাসও বাজেটে পরিলক্ষিত হয়নি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি–কোথায়, কার মাধ্যমে, কোন প্রক্রিয়ায় হবে তার

কোন দিকনির্দেশনা বাজেটে নেই। আর জেন্ডার বাজেটিং-এর প্রসঙ্গ রয়েছে কাগুজে অবস্থাতেই।

সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী–প্রতিশ্রুতিহীন প্রস্তাবনা: সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইফুর রহমান মন্তব্য করেছেন যে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি না হলে দেশের ২২ লক্ষ বয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যেককেই বয়স্ক ভাতার আওতায় আনা যেতো। বহিঃস্থ ক্রিয়া দিয়ে অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ঢাকবার এ প্রচেষ্টা সঠিক যুক্তি নয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কথা জোরে শোরে বলা হলেও প্রকৃত বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে সীমিত। উপকরভোগীর নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু এখনও কমপক্ষে ৫০ শতাংশ দরিদ্র প্রবীণকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। দুস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২৫ হাজার। রাজস্ব বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ বরাদ্দেই ৫০ শতাংশ দরিদ্র প্রবীণকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে ভাতা দেয়া সম্ভব হতো। অথচ বর্তমান রাজস্ব বাজেটের ১ শতাংশেরও কম বরাদ্দ যাচ্ছে বয়স্ক ভাতার অর্থায়নে। তাছাড়া বিশাল এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঝুলছে ভাতার আর্থিক পরিমাণ, ব্যবহার এবং ছাড়ের মাথায়। গতবছর প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৫ কোটি টাকা। অথচ গতবছর জুড়ে ছাড় করানো যায়নি একটি টাকাও। এ অর্থবছরে বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। কিন্তু এই বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ে এবং ছাড় হলে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে তা উপযুক্ত ব্যবহার নিয়ে আমাদের রয়েছে ঘোরতর সংশয়। অন্ততঃ সাম্প্রতিক অতীতের বিশ্লেষণে একথার সত্যতাই প্রমানিত হয়। তাছাড়া বয়স্ক ভাতা যেখানে মাথাপিছু বেড়েছে মাত্র ৬৬ পয়সা, সেখানে প্রতিরক্ষাখাতে ৪১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি বাজেট প্রক্রিয়ার জনকল্যাণবিমুখতাই নির্দেশ করে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিষয়টি এবারের বাজেটে যে প্রতিশ্রুতিহীন এক প্রস্তবনা মাত্র তার আরো কারণ হল এই যে এ বাজেটে দেশের ব্যপক প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বাজেট প্রস্তাবনা নেই– এমনকি উল্লেখই নেই ভূমিহীন মানুষের কথা, নিম্ন বেতনভুক্ত সরকারী কর্মচারীসহ নিম্নবিত্ত মানুষের কথা, বস্তিবাসীর কথা, আদিবাসী মানুষের কথা, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের কথা, বেদেদের কথা, চরের মানুষের কথা, ভিক্ষুকদের কথা, নগরের ভাসমান মানুষের কথা, শিশু শ্রমিকদের কথাসহ প্রান্তিক সবমানুষের কথা। ভাবখানা এই যে এসব মানুষ মানুষই নন। আসলে মানুষের জন্য বাজেট না হয়ে বাজেটের জন্য মানুষ হলে এমনটিই হবার কথা– এসবই প্রমাণ করে বাজেটের সাথে জনকল্যাণহীনতার যোগসূত্র।

কালো টাকা সাদাকরণ–কৌশল থেকেই যাচ্ছে: দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে কালো টাকা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতি যে বহাল থাকবে তাও এবারের বাজেটে স্পষ্ট। ২০০৬-২০০৭ সালের বাজেটে গত অর্থবছরের মত কালো টাকা সাদা করার কোন প্রত্যক্ষ সুযোগ না থাকলেও পরোক্ষ নানান সুযোগ রাখা হয়েছে। অভিজাত এলাকায় বাড়ি এবং গাড়ী কেনার ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ করসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে গাড়ী-বাড়ী কেনার মধ্য দিয়ে কালো টাকার মালিকরা টাকা সাদা করতে পারবেন। ঢাকার গুলশান, বনানী, বারিধারা, ধানমন্ডি, ডিওএইচএস ইত্যাদি এলাকায় এবং চট্টগ্রামের খুলশী ও পাঁচলাইশ অভিজাত এলাকায় বাড়ী ও ফ্ল্যাট ক্রয়ে কর পূণর্নির্ধারণ এবং গাড়ী কেনার কর ৫ ও ৭.৫ শতাংশ থেকে ১০ ও ১৫ শতাংশ করা হয়েছে কালো টাকা সাদা করার পরোক্ষ কৌশল হিসেবেই। বর্তমানে দেশে যেখানে কয়েক লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা রয়েছে সেখানে ৭.৫ শতাংশ কর পরিশোধের মাধ্যমে গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে মাত্র ১ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা সাদা হয়েছে আর ঐ বাবদ সরকার পেয়েছে মাত্র ৯৮ কোটি টাকা। ঐ ব্যবস্থায় বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রকৃত করদাতারা। যেখানে ১০ লক্ষ টাকা সাদা করতে একজন কালো টাকার মালিককে দিতে হতো ৭৫ হাজার টাকা, সেখানে প্রকৃত করদাতাকে সাদা টাকার বিপরীতে কর গুনতে হতো ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। দূর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতায় যেখানে সকলেই উদ্বিগ্ন, প্রতিবছর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান যেখানে বরাবরই শীর্ষে সেখানে প্রকারান্তরে দূর্নীতিকে উৎসাহিত করার এই 'কালো টাকা সাদা করার সহজ কৌশল' স্বভাবতঃই হয় ব্যাপক বিতর্ক এবং নিন্দার মুখোমুখি। সেইসূত্র ধরে এবার কালো টাকা সাদা করার সহজ কৌশলটিকে রদবদল করা হলেও কালো টাকা সাদা করার কায়দা রয়েই গেলো। কালো টাকার মালিকরা খরচ একটু বাড়িয়ে সহজেই কালো টাকা সাদা করতে পারবে, অন্যদিকে সবসময়ের মত অসুবিধায় পড়বে সীমিত আয়ের মানুষ যাদের 'বাড়তি খরচ' করার সঙ্গতি নেই। কালো টাকা সাদা করার এসব কুটকৌশল একদিকে যেমন নৈতিক স্খলন ত্বরান্বিত করবে তেমনি অন্যদিকে উৎপাদনবিমুখ কর্মকাণ্ডে প্রেরণা দেবে যা কোন অর্থেই উন্নয়ন সহায়ক হবে না।

কৃষি প্রসঙ্গ–কৃষি প্রধান দেশ কিন্তু গুরুত্ব নেই : আপাত দৃষ্টিতে বাজেটে কৃষি প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে বলেই মনে হয়। বেড়েছে বরাদ্দ, রয়েছে ভর্তুকিও। এবারে কৃষিখাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৫৮০৬ কোটি টাকা, যা গত বাজেটের বরাদ্দের তুলনায় ১০৭৭ কোটি টাকা বেশি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে কৃষি প্রধান এ দেশে কৃষি খাতের বাজেট বরাদ্দটি প্রতিরক্ষা খাতের 'দৃশ্যমান' বরাদ্দের কাছাকাছি। অর্থাৎ সরকারের কাছে কৃষি ও প্রতিরক্ষা সমগুরুত্ব খাত। কৃষি ভর্তুকি ১ শ' কোটি টাকা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা (ভর্তুকি ও কৃষি পুনর্বাসনসহ)। তবে খতিয়ে দেখলে এবং পুরনো বাজেটগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই বরাদ্দ সুবিধে পেয়ে থাকেন

গুটিকয়েক মানুষ– প্রকৃত কৃষক পান না। প্রকৃত কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে কৃষি ভর্তুকি কৃষি জিডিপির ১০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

এবারকার বাজেটে কৃষি গবেষণা খাতে ২৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব ইতিবাচক হলেও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য– কৃষি জিডিপির মাত্র ০.৪ শতাংশ। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতেও এই খাতে বরাদ্দ কৃষি জিডিপির ৫ শতাংশ। বিশেষ করে শস্য খাত (একই ফসল বার বার একই জমিতে চাষ এবং সারের সুসমন্বিত ব্যবহারের কারণে) যা ক্রমাগতভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস করে এবং এবং বন্যা-খরা ও আবহাওয়া পরিবর্তনে খাপ খাওয়াতে যোগ্য ফসলের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সমাধানের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণায় অনেক বেশি জোর দেয়া উচিত ছিলো। তাছাড়া আমরা প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। এমতাবস্থায় কৃষি গবেষণায় সুচিন্তিত বরাদ্দ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর আমাদের জনসংখ্যা যখন বাড়ছে ১.৫৪ শতাংশ হারে তখন ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাসের জন্য এই খাতে ব্যপক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বরাদ্দ প্রকৃত কৃষকের হাতে পৌছানো অত্যন্ত জরুরী। যা বাজেটে অনুপস্থিত ।

এরপরও, সবচে' গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি-দুস্প্রাপ্যতা, সিন্ডিকেটিজ্‌ম এবং সরবরাহ ব্যবস্থার সংকটের কারণে বর্দ্ধমান বরাদ্দ এবং ভর্তুকি জরুরী। কিন্তু দুর্নীতির ব্যাপকতা– রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদির কারণে ঈপ্সিত উপকারভোগীদের কাছে সাহায্য সহায়তা পৌছানোর বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যাবে। গত বছর আমদানি পর্যায়ে সারের উপর ভর্তুকি দিলেও তা কৃষকের কাছে পৌছায়নি। অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে ভর্তুকির টাকা কৃষকের কাছে পৌছায় না। বিএডিসি বা এমন কোন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে সার বিতরণ করার ক্ষেত্রে যদি বিপনন ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক না হয়, ডিলার নিয়োগে থাকে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব তাহলে স্বাভাবিকভাবেই লাভবান হবে মধ্যস্বত্বভোগীরা। সেটাই হচ্ছে। এমতাবস্থায় কৃষি ভর্তুকি এবং পন্য সরবরাহে আরও সুনিশ্চিত এবং কার্যকর নীতিমালা প্রয়োজন ছিলো, কিন্ত এবারের বাজেটে এসব এড়িয়ে বলা হয়েছে গতানুগতিক কথা আর স্তুতি। তাছাড়া বাজেটে হাইব্রিড বীজের নামে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে আগ্রাসনের যেমন সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হলো তেমনি পরিবেশ এবং কৃষি বিপর্যয়ের পথকেও করা হলো সুগম।

শিল্পায়নে অনীহা: শিল্প খাতটি আমরা বাজেটে যে আকারে দেখতে পাই তার পোশাকি নাম দেয়া হয়েছে শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস; তার মধ্যে রয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এখানে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোকে কোন মতেই শিল্পায়নের সাথে অঙ্গীভূত

করা যায় না। এমনিতেই শিল্প মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ অতি নগন্য, ২৫২ কোটি টাকা। আর গতবছর বরাদ্দ ২৯৭ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত হয়ে তা ২৬২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই নগন্য বরাদ্দটুকুও যখন সংশোধিত হয়ে কমে আসে তখন দেশজ শিল্পভিত্তি গড়বার ক্ষেত্রে সরকারের অনীহাই প্রকাশিত হয়। এ অনীহা আরো বেশি স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে আসলে শিল্প স্থাপনে বাজেটে উৎসাহ/কৌশল অনুপস্থিত, আর ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প নিয়ে প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবে ফলপ্রদ নয়।

গার্মেন্টস শিল্প প্রসঙ্গ–অনুপস্থিত: আমাদের রপ্তানীখাতের শীর্ষ আয় করছে গার্মেন্টস শিল্প। এখাতে কাজ করে প্রায় ২০ লাখ শ্রমজীবী যাদের অধিকাংশই নারী। এইখাতে 'ভ্যালূ এডিশন কম' এমন সত্য অভিযোগ সত্বেও এই বৃহৎ সেক্টরটি যে আমাদের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি বর্তমানে রয়েছে ভীষণ ঝুঁকির মুখে, পুরো গার্মেন্টস শিল্পটিই অতিবাহিত করছে ভীষণ এক দুঃসময়। অথচ এবারকার বাজেটে গার্মেন্টসখাত নিয়ে তেমন কোন কিছুই শোনা যায়নি। বাজেট প্রক্রিয়া দেশের পুরো অবস্থার একটি চিত্র এবং দিকনির্দেশনা বহন করবে, অন্ততঃ মোটাদাগে হলেও, সেটিই কম্য। অথচ বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পের ঘোর সঙ্কটকালেও বাজেটে এহেন উদাসীনতা পুরো বাজেট প্রক্রিয়াকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। শুধুমাত্র গার্মেন্টস শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সামান্য কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি টাকা, এবার সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি টাকায়। রেডিমেট গার্মেন্টস নিয়ে কোনো নতুন প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। উইভিংখাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ গঠন যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে এর পেছনে বাজেট প্রক্রিয়ার উপস্থিতি কাম্য হলেও তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

প্রতিরক্ষা বাজেট–কেউ জানে না কত! এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে "দৃশ্যমান" বরাদ্দ ৪৯০৪ কোটি টাকা, যা গতবারের চেয়ে ৫৮৪ কোটি টাকা বেশি। আমরা আগেই বলেছি যে বর্তমান সরকারের কাছে প্রতিরক্ষা খাত কৃষি খাতের মতই সমগুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, দেখা গেছে গত অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতে সংশোধিত বরাদ্দ মূল বরাদ্দের চেয়ে ১৬৬ কোটি টাকা বেশী (শুধু "দৃশ্যমান" বরাদ্দ)। প্রতিরক্ষা বাজেটকে 'টপ সিক্রেট' এর মোড়কে আবদ্ধ রেখে পুরো প্রক্রিয়াটিকেই করে রাখা হয়েছে অস্বচ্ছ। তাছাড়া এই খাতে বিভিন্ন ভাতাদি, সুবিধাদির অবস্থান বাজেটের কোথায় সেটিও সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া সামরিক শিক্ষা খাতের বরাদ্দকে প্রতিরক্ষা খাতের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। এছাড়া আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষানীতিই যেখানে নেই সেখানে এই বিষয়গুলো হয়ে ওঠে আরও প্রশ্নবিদ্ধ। প্রতিরক্ষা খাতে 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যমান উন্নয়ন বাজেট ব্যয় হয়ে থাকে সেটার পরিমাণ 'টপ সিক্রেট'। এমনকি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির

মাধ্যমেও সে বিষয়ে কোন কিছুই জনগণকে জানানো হয় না। বিষয়টি যাই হোকনা কেন এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করছি তার সাথে মানব উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। প্রতিরক্ষা খাতের নানা রকমের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করা হলে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনমনে এ নিয়ে যে নানা প্রশ্ন আছে তা প্রশমিত হবে।

তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ–সংকট বাড়বে: জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে অর্থ মন্ত্রী বলেছেন, 'ইট ইজ নট এনাফ', 'এ মূল্যবৃদ্ধি অর্থনীতির তেমন উপকারে আসবে না'। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতিকে নানান সংকটে ফেলেছে এ কথা সত্যি। এমতাবস্থায় জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া গেলেও বাজেটে এই অভিঘাতকে সহনশীল মাত্রায় নিয়ে আসবার কোন কার্যকরী কৌশলের কথা অনুপস্থিত। জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের পরিবহন খাতে পারিবারিক ব্যয়সহ তেল-ভিত্তিক পণ্যের উপর এবং ফলে দেশের বিভিন্ন মানুষের জীবন যাত্রায় কি প্রভাব/অভিঘাত ফেলবে এ সম্পর্কে বাজেটে কোন ধরণের নির্দেশনা নেই।

গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহারে জ্বালানি নির্ভরতা কমানোর জন্য বরাদ্দের কথা উল্লেখ নেই বাজেটে। সেটি কি ইঙ্গিত বহন করে না যে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্যাসের ব্যবহার সুনিশ্চিত এবং বৃদ্ধি করার চেয়ে গ্যাস বিক্রির চিন্তা এখনো শক্তিশালী। বাজেটে গ্যাস উত্তোলন এবং বিতরণ নিয়ে কোন মন্তব্যই নেই। জনকল্যাণকামী কয়লা নীতির অনুপস্থিতিতে, কয়লা উত্তোলনের যে পদ্ধতি সেটি যখন রীতিমত আশংকাজনক যার ফলে কমবে কৃষিজমি, সেরকম একটি অস্বচ্ছখাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯২.৫ শতাংশ।

আমাদের দেশের মাত্র ৩০-৩২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। তাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই শহরের বাসিন্দা। বিদ্যুৎ প্রাপ্তি আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ১৩৯ কিলোগ্রাম (ওয়েল ইকুইভ্যালেন্ট)। অথচ সার্কভুক্ত নেপালে ৩৫৮ কিলোগ্রাম, শ্রীলংকায় ৪০৬ কিলোগ্রাম, পাকিস্তানে ৪৪৪ কিলোগ্রাম, ভারতে ৪৮২ কিলোগ্রাম। উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎপ্রাপ্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মাথাপিছু বিদ্যুৎপ্রাপ্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। আবার "২০২০ সালে সবার জন্য বিদ্যুত" এ তো জাতীয় নীতি। এক্ষেত্রে বাজেটে শুধু এখাতে বরাদ্দ নয়, বরঞ্চ সুনির্দিষ্ট নীতি এবং লক্ষ্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রতিবছরই বরাদ্দের চেয়ে বেশি খরচ হয় এইখাতে। গত অর্থবছরেও বরাদ্দ ছিল ৩,২৭০ কোটি টাকা কিন্তু ব্যয় হয়েছিল ৩,৩৯৭ কোটি টাকা। অথচ বিদ্যুৎখাতে আমাদের উন্নয়ন

যে নেতিবাচক সেক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেমন নব-সংযোজন নেই কেনো? কেনো কানসাট ঘটে? এ খাতে বরাদ্দ যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি এর সঠিক ব্যবহার নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এছাড়া বিদ্যুৎখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বিদ্যুৎখাতে নতুন প্রকল্প মাত্র দু'টি।

শিক্ষা, প্রযুক্তি ও ধর্ম প্রসঙ্গ–কি নিয়ে কথা? বলা হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি। বিষয়টি যথেষ্ট মাত্রায় অস্বচ্ছ, দুর্বোদ্ধ এবং পাটিগাণিতিক মারপ্যাচ সমৃদ্ধ। কারণ শিক্ষা বলতে মুল ধারার শিক্ষার সাথে আর কি কি যোগ করা আছে তা বোঝা দুষ্কর। তাছাড়া ধর্মসহ প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষায় বরাদ্দ কোথায় গেলো সে বিষয়টিও কুয়াশাচ্ছন্ন। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে ৩৩ শতাংশের মত। অথচ আগের বছরের প্রাক্কলিত ব্যয় বাড়েনি। বাড়েনি প্রাথমিক শিক্ষার মান, সাংবিধানিক বিধান হওয়া সত্বেও গ্রামে-শহরে, ধনী-গরীবের মাঝে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার ফারাক হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশ-পাতাল। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বাদই দিলাম। এই প্রসঙ্গটি বাজেটে রয়ে গেছে উপেক্ষিত। অথচ শিক্ষা কোন পণ্য নয়। আর শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধি করে, গুনগতমানের বৃদ্ধি না ঘটিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন যে অসম্ভব সে প্রসঙ্গটি সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ৪৪ শতাংশ। কিন্তু কোন খাতে কত সেটি রয়ে গেছে অস্পষ্ট। গতবছরই মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে 'একমুখী' শিক্ষার নামে অর্থ অপচয়ের পরও প্রাক্কলিত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই রয়ে গেছে অব্যয়িত। নারী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা সম্মন্ধে বাজেটে নানান কথা বলা হয়েছে সত্যি, কিন্তু উন্নয়ন লক্ষ্যটিই অস্পষ্ট। এই খাতে বরাদ্দ থেকে আমরা আগামী বাজেটের আগে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাবো সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বলা হয়নি কিছুই। তাছাড়া প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বাজেটের প্রসঙ্গটিও রয়ে গেছে আলোচনার বাইরে। প্রতিরক্ষা বিষয়টির মতই প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিষয়টিকেও রাখা হয়েছে 'টপ সিক্রেট'। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দে স্বচ্ছতা ছাড়া, উন্নত শিক্ষার লক্ষ্য কিভাবে অর্জন হবে সেটি বড় প্রশ্ন। ধর্ম শিক্ষার প্রকৃত বরাদ্দ কত? যদিও আমরা জানি গত বছরে ধর্ম শিক্ষার সংশোধিত বাজেট ছিল মূল বাজেটের বেশি। জাতীয় উন্নয়ন এবং দারিদ্র হ্রাসের কোন লক্ষ্য অর্জনে এ বরাদ্দ-তা স্পষ্ট করা হয়নি।

জনগণের স্বাস্থ্য–অবহেলিত বিষয়ঃ স্বাস্থ্যখাতে গতবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১৬ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে বলে বাজেটে যে আত্মতুষ্টির প্রবণতা দেখা গেছে সেটি কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বিশ্ব সংস্থার হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় যেখানে ১২ ডলার হওয়া উচিত সেখানে আমাদের দেশে এই ব্যয় মাত্র ৪ ডলার। সাম্প্রতিককালে স্বাস্থ্য খাতকে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলখাত হিসেবে বিবেচনা করে জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ কমপক্ষে ৫০

শতাংশ বৃদ্ধি করা উচিত। ২০০০ সালের পর থেকে প্রতি লাখে এক জন করে মাতৃ মৃত্যু কমার হার অব্যহত থাকলেও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে লেগে যাবে আরও ১৫৬ বছর। এমতাবস্থায় বাজেটে জন-স্বাস্থ্যে বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিশেষতঃ দারিদ্রের রোগ নির্নয়ক উপখাতসমূহে বরাদ্দ প্রাধান্য দেয়া উচিত ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত যক্ষ্মা, ম্যালিরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জম্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুর রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া, হাম এবং আর্সেনিকোসিস। অথচ পুরো বাজেট প্রক্রিয়ায় অন্যান্য খাতের মত 'শ্লোগানমূলক' কিছু সংখ্যা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ ছাড়া এই সুনির্দিষ্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি।

উপসংহার

বলাবাহুল্য জাতীয় ব্যবস্থাপনায় জনকল্যাণকামী আঙ্গিক অনুপস্থিত। প্রস্তাবিত নতুন বাজেটও তাই মূলত ক্ষমতাকাঠামোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও খামখেয়ালিপনাদুষ্ট গতানুগতিকার আরো একটি দলিল। দেশের সাধারণ মানুষ বাজেটের ভাষণ-অংশে উপস্থিত কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উপেক্ষিত। আর তাদের জন্য সামান্য যা আছে তা দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের কারণে তাদের কাছে পৌছবেনা, পৌছে না। বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত আছে যে, প্রজাতন্ত্রের মালিক ধর্ম-বর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদেশের সকল নাগরিক এবং সকলের জন্য সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টি করতে হবে। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পর আমাদের সমাজ সমতা-ভিত্তিক তো নয়ই বরং পিরামিড আকৃতির হয়ে উঠেছে। সামান্য কিছু ধনী ক্ষমতাধর মানুষের অবস্থান উপরে, মধ্যে রয়েছে এলোমেলো মধ্যশ্রেণী আর নিচে রয়েছে বিশাল দরিদ্র পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠি। এ দেশে টেকসই সামাজিক বিবর্তন কাম্য হলে অংশদারীত্বমূলক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা জরুরি।

বলাবাহুল্য যে পথে দেশ এগিয়ে চলছে তা কারো জন্য মঙ্গলজনক নয়। ক্ষমতাধররাও সুরক্ষার নিশ্চয়তা পাবেন না। দেয়ালে পিঠ ঠেকলে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায় এবং ফুঁসে উঠে। কানসাট ও ডেমরার জনআন্দোলন এবং তৈরিপোষাক শিল্পের শ্রমিক আন্দোলন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। জাতীয় বাজেট এক চলমান সমাজের সার্বিক ব্যবস্থায় মূলত একটি বার্ষিক অর্থনৈতিক কৌশলপত্র। একে সেই সামাজিক চলমানতা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করার অবকাশ নেই। কাজেই অবস্থা বদলের জন্য ব্যবস্থা বদলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি ভিত্তিতে শুরু করা চাই। অন্যথায় ব্যবস্থা বদলের লক্ষ্যে কানসাট প্রদর্শিত পথে দেশের দিকে দিকে অবহেলিত পিছিয়েপড়া মানুষ ফুঁসে উঠতেই পারে।

বাংলাদেশ সরকারের ২০০৭-২০০৮ অর্থ-বছরের বাজেট উত্তর প্রতিক্রিয়া– সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
ড. আবুল বারকাত **

ভূমিকা

একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন দেশ পরিচালনা করছেন। এবারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার অতীতের যে কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেয়ে ভিন্ন। সরকার বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন যার মধ্যে অন্যতম হল দুর্নীতি হ্রাসের উদ্যোগ, নির্বাচন কমিশন সংস্কার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংস্কার ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রত্যাশা ছিল যে– এবারের বাজেটটি হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কল্যাণের এক মডেল। যে বাজেটে কয়েকটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা ও কর্মকৌশল থাকবে: দারিদ্র বিমোচন, দ্রব্যমুল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি রোধ, মূল্যস্ফীতি হ্রাস, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি। জনকল্যাণকামী বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আমরা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে গত ৫ এপ্রিল ২০০৭-এ মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার আমন্ত্রণে তার সাথে দেখা করি এবং প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্যসমূহ উপস্থাপন করি। আমাদের মূল বক্তব্য ছিল "মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে একদিকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়াতে হবে, আর অন্যদিকে প্রবৃদ্ধির ফল ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে সুষম বণ্টন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন মানব উন্নয়ন দর্শনের

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তন, ঢাকা: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/ ১৪ জুন ২০০৭

প্রতি গভীর আস্থা এবং এ দর্শন বাস্তবায়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি"। এবারের বাজেটের একটি ভাল দিক হলো বাজেট প্রস্তাবনার পরে অর্থ উপদেষ্টা প্রস্তাবিত বাজেটের উপর প্রতিক্রিয়া-সুপারিশ-এর সময় দিয়েছেন। এ জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে আমরা মাননীয় অর্থ উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই। আর এই সুযোগে আমাদের বিশ্লেষণাত্মক প্রতিক্রিয়া-সুপারিশ উপস্থাপন করছি।

২০০৭-'০৮ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা কি সুপারিশ করেছিলাম

সাংবিধানিক অঙ্গিকার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক জনকল্যাণকামী বাজেট প্রণয়ন ত্বরান্বিত করতে আমরা অনেকগুলো সুপারিশ করেছিলাম– যা বৃহৎ পরিসরের উন্নয়ন দর্শন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পরিসরের খাত ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০০৭-'০৮ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের দিকনির্দেশনামূলক অন্যতম সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কর্মযজ্ঞের মাধ্যমেই একই সাথে জাতীয় আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস এবং বৈষম্য হ্রাস সম্ভব। মৌলিক এ কাজটির কাঠামো বিনির্মাণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় শাসন কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

২. বাজেট বরাদ্দে কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি: অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারের ব্যয়-বরাদ্দ অগ্রহণযোগ্যভাবে বেশি, আর মানব উন্নয়নে বরাদ্দ স্বল্প– কাঠামোটি উল্টে দেয়া দরকার। অনুৎপাদনশীল খাতসমূহে সরকারি ব্যয়ের স্ফীতি মানব উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্খিত অগ্রগতিকে অব্যাহতভাবে বিঘ্নিত করে চলেছে।

৩. বাজেটকে হতে হবে দরিদ্র-বঞ্চিত নারী-পুরুষের সাংবিধানিক ও ন্যায়-অধিকার সুরক্ষার দলিল। বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কিভাবে এবং সংশ্লিষ্ট বছরে কতটুকু মানব বঞ্চনা-দুর্দশা ও দারিদ্র দূরীকরণসহ সকল ধরণের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে। ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষক, কর্মচ্যুত মানুষ, ভাসমান মানুষ, ভিক্ষুক মানুষ, গ্রাম-শহরের নারী প্রধান খানা, বয়োবৃদ্ধ মানুষ, বস্তিবাসি, চরের মানুষ, হাওর-বাওরের মানুষ, জলাবদ্ধ মানুষ, উপকূলের দুর্যোগগ্রস্ত মানুষ, রিক্সা-ভ্যান-ঠেলাগাড়ী চালক, আদিবাসি মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের

মানুষসহ সকল প্রান্তিক-ভঙ্গুর মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রস্তাবনা বাজেটে থাকতে হবে। চিরন্তনভাবে বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত এসব মানুষকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম-সুযোগ এবং সহ-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

৪. জমি-জলা সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। দেশে ২ কোটি বিঘা খাস জমি-জলা এখন জমি-জলাদস্যুদের বেদখলে। এসব খাস জমি-জলা দরিদ্র মানুষেরই ন্যায্য হিস্যা। তা কিভাবে দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের মালিকানায় যাবে এ বিষয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে।

৫. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাসমূহ ক্রমাগতভাবে অধিকহারে বৈষম্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি। শিক্ষার বাজারীকরণ রোধে শিক্ষাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দর্শন থেকে মুক্ত করা জরুরি। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে মূলধারার শিক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভারে বাড়াতে হবে।

৬. সমাজে শিক্ষকদের যথাযোগ্য সম্মান প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, শিক্ষায় মেধাবী মানুষদের আকৃষ্ট করা এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি থেকে শিক্ষক পরিবারকে বাঁচাতে সকল স্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি জরুরি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে দেশের ৩৭৭৮-টি কম্যুনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৬৩৪ জন শিক্ষক প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়ান। বিনিময়ে তারা প্রত্যেকে মাসে মাত্র ১২০০ টাকা সম্মানী-ভাতা পান। এসব শিক্ষক গত বছর আমরণ অনশন এবং গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। এসব শিক্ষকদের জন্য সরকারী বার্ষিক বরাদ্দ এখন মাত্র ১৪ কোটি টাকা, অথচ বছরে আর ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলে (১৬তম গ্রেডের বেতন স্কেল অনুযায়ী) এসব শিক্ষক একটু খেয়েপরে ১০ লাখ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারেন। এত স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা তো কল্পণাতীত। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা কোথায়?

৭. জনগণের স্বাস্থ্য বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি জনগণের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। এ লক্ষ্যে জনগণের স্বাস্থ্যকে উত্তরোত্তর অধিক হারে বাজারের হাতে সোপর্দ করার সর্বনাশা প্রবণতা রোধ করতে হবে।

৮. স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ কমপক্ষে ৫০% বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে দারিদ্রের রোগ (diseases of poverty)-কে প্রাধান্য দিতে হবে, যার মধ্যে আছে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, প্রজননতন্ত্রের রোগ, জন্মদান প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুদের রোগ, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমন, ডায়রিয়া, হাম এবং আর্সেনিকোসিস।

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

১০. কৃষি গবেষণায় কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।

১১. কৃষির বহুমুখীকরণ-উদ্দিষ্ট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

১২. ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। কেরোসিনের মূল্য বাড়ানোর ফলে দারিদ্রের উপর বড় রকমের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আর দুর্নীতি দমনের কারণে যে অর্থ সাশ্রয় হবে তা দিয়েই এ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

১৩. চোরাচালান রোধে "সীমিত উদারিকরণ, সীমিত নিয়ন্ত্রণ" নীতির আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে ঐসব পণ্যের আমদানি শুল্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনতে হবে (শূন্য শুল্কসহ)।

১৫. ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট কর-রাজস্ব ফাঁকি রোধে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৬. এগারো কোটি বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত মানুষ কিভাবে ও কোন সময়ের মধ্যে (পর্যায়ক্রমে) বিদ্যুৎ সুবিধে পাবে– তা উল্লেখ করতে হবে। সেই সাথে "২০২০ সনের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ"– জাতীয় এ লক্ষার্জনে বাজেটে সুস্পষ্ট কর্মকৌশল থাকতে হবে।

১৭. নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচি ও লক্ষসমূহকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং বাজেটে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। বাজেটে নারী-উদ্দিষ্ট কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে: অশনাক্তকৃত নারী যক্ষ্মা রুগীর সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় বরাদ্দ ২ গুণ বাড়াতে হবে; ১০০% নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৪গুণ বাড়াতে হবে; ক্রীড়া খাতে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ ৪গুণ বাড়াতে হবে; মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় বরাদ্দ (যে খাতে আলাদা

বরাদ্দ নেই) ৩ গুণ বাড়াতে হবে; নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ৩০ গুণ বাড়াতে হবে।

১৮. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাছে ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সকল ব্যাংকে তাদের ঋণের অন্তত ১০% স্বল্প পুঁজি-সম্পন্ন উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে। এ ঋণ হতে হবে চাহিদা-তাড়িত সরবরাহ-চালিত নয়।

১৯. তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও তাতে ব্যাপক মানুষের অভিগম্যতা বাড়াতে সব ধরণের অনুকূল পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সাথে জানাচ্ছি যে, জনকল্যাণকর একটি বাজেট রচনার লক্ষ্যে আমরা উল্লেখিত যে সব সুপারিশ করেছিলাম তার খুব কমই গৃহীত হয়েছে। গৃহীত হয়নি জনকল্যাণের মূল দর্শনটি, বিপরীতে অতিমাত্রায় বাজার নির্ভরতাসহ বিদেশী ঋণ-বান্ধব দর্শনটিই এবারের বাজেটেও প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে আর যাই হোক দারিদ্র বিমোচনে কাঙ্খিত অগ্রগতি হবে না, বৈষম্য বাড়বে এবং দেশজ উদ্যোগ ব্যহত হবে।

এবারের বাজেটে মানুষের আকাঙ্খা কি ছিল

এবারের বাজেট নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি ছিল না, আর আকাঙ্খা ছিলো অনেক। যেহেতু দেশে এখন প্রচলিত অর্থের রাজনৈতিক সরকার নেই সেহেতু সকলের আশা ছিল এই বাজেটে শুভঙ্করের ফাঁকির মাত্রা থাকবে কম। এমন আশাও করা হয়েছিলো যে এবারকার বাজেট হবে মানুষের জন্য, বাজেটের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু আমরা অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে এবারকার বাজেট নিবিড় পর্যালোচনার পরও এ থেকে তেমন আশাবাদী হবার মত উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে নগণ্য মাত্রায়। সবমিলিয়ে এবারকার প্রস্তাবিত বাজেটকেও আমরা অতীতের রাজনৈতিক সরকারগুলো প্রণীত বাজেটের মতই গতানুগতিক বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই বাজেটে কাঠামোগতভাবে ভিন্নতা কিছু নেই; রয়েছে অনেক ভারসাম্যহীনতা। বিশেষত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, ঘাটতিপূরণে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য ও ব্যাংক নির্ভরতা, ভারসাম্যহীন শুল্ক কাঠামো, দেশজ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের হতাশ করেছে। বলা হয়েছে অনেক কিছুই, কিন্তু দেশের এই সময়কার চ্যালেঞ্জ– দ্রব্যমূল্য হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, যুব-দারিদ্র নিরসনে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা– ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাব আমাদের ব্যথিত

করেছে। ফাঁকঝোক রয়েছে বরাদ্দ নির্ধারণে, অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। দেশের ৮৫-৯০ শতাংশ মানুষ নির্দিষ্ট আয়ের, স্বল্প আয়ের এবং ব্যপকাংশ মূলত দরিদ্র। প্রকৃত আয় বৃদ্ধি না হবার কারণে আর কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বল্পতার কারণে মানুষের প্রধান সমস্যা এখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। দ্রব্যমূল্য কমানোর কোনো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ বাজেটে নেই যদিও ধারাবাহিকভাবে কিছু আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শুল্ক হ্রাস/বিলোপ প্রস্তাব করা হয়েছে যা আগেও কাজ করেনি এবং এখনও করবে না বলে ধরে নেয়া যায়। তদুপরি অর্থ উপদেষ্টার সাম্প্রতিক মন্তব্যে আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে সরকারের অপারগতা বিষয়টি জানতে পেরে আমরা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। দরিদ্র-নিঃবিত্ত-নিঃ মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রকৃত আয় বাড়ানোর কোনো দিকনির্দেশনাও এই বাজেটে অনুপস্থিত। এ অবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে এবং এমন সম্ভাবনাও নাকচ করা ঠিক হবে না যে ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যাভাব সৃষ্টি হতে পারে। এতদসত্ত্বেও, গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানে এবং মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাজেট কতটা অবদান রাখবে তা বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিবেচনায় সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের প্রতিক্রিয়া-সুপারিশ বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বিশালাকৃতির বাজেট: যথেষ্ট ভারসাম্যহীন

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটের আয়তন ৮৭,১৩৭ কোটি টাকা যা গতবারের (২০০৬-০৭) প্রস্তাবিত বাজেটের ২৫ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটের ৩০ শতাংশ বেশি। গতবারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবারের বাজেট প্রণয়ন পেশাদারী বিবেচনা থেকে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এমনটি বলার অবকাশ নেই। গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ২০,৩০১ কোটি টাকার বেশি এ বাজেট-যথেষ্ট মাত্রায় উচ্চ প্রস্তাবনা। তবে যদি কর প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি দমনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয় এবং প্রশাসনিক ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত দক্ষতা যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় তবে রাজস্ব আয় ও ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়ে অর্জন আগের চেয়ে অধিক হতে পারে। তবে এর ফলে সাধারণ মানুষের জন্য অর্জন কি হবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের ওপর জোর দেয়া হলেও তা অর্জনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। চলতি বছরে কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়ে পিছিয়ে আছে সরকার। তবু আগামী বছরের আয়ের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৫৭,৩০১ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭,৮২৯ কোটি টাকা বেশি। এই রাজস্ব আদায় চাপের ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাটের আওতা

ব্যাপকভাবে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব আয়ের মধ্যে সবচে' বেশি অর্থ পরোক্ষ কর খাত থেকেই আসে, যার বেশির ভাগই দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। অর্থাৎ, ঘুরে ফিরে 'উদোর পিণ্ডি' মানে করের বোঝাটি গিয়ে চাপছে 'বুধো' মানে সাধারণ জনগণের ঘাড়েই।

এই বাজেটে উৎপাদনশীল খাত অপেক্ষা অনুৎপাদনশীল খাত বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। বাজেট ঘাটতি পূরণ হবে বৈদেশিক উৎস (ঋণ-অনুদান) এবং দেশজ ব্যাংক ঋণ-এর মাধ্যমে। আর সরকার যদি বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়, তখন ব্যাংক থেকে বিপুল অংকের ঋণ নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ফলে অর্থনীতির সাধারণ সূত্রমতেই চাপ পড়বে মূল্যস্ফীতির ওপর; বর্তমানের অসহনীয় দ্রব্যমূল্য পৌঁছে যাবে 'অসম্ভবের' কাছে। আর সরকার অধিকমাত্রায় ঋণ নিতে থাকলে কমবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ঋণ– কমবে বিনিয়োগ। বিনিয়োগ কমলে হ্রাস পাবে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি, বিরূপ প্রভাব পড়বে সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

বরাদ্দ কোথায়, কেন?

এবারের বাজেট কাঠামোগতভাবে যথেষ্ট ভারসাম্যহীন। ৮৭,১৩৭ কোটি টাকার বরাদ্দে অনুন্নয়নখাতে বরাদ্দ ৫৩,০০০ কোটি টাকা যার বড় অংশ জনপ্রশাসন এবং নিরাপত্তা খাতে ব্যয় হবে। এবারের বাজেটে গতবছরের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ১৭,০০০ কোটি টাকা বাড়ানো হলেও উন্নয়ন ব্যয় বেড়েছে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। এর মানে উৎপাদনশীল খাত অপেক্ষা অনুৎপাদনশীল খাতকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার সিংহভাগ ব্যয় হবে ৯২৭-টি বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে। এই প্রকল্পের মধ্যে নুতন মাত্র ৩৮টি। বাকি ৮৮৯-টি প্রকল্প বিগত সরকারের নেয়া। বিগত সরকারের প্রকল্পে অর্থব্যয় অব্যাহত রাখা, সময় এবং চাহিদামতো নতুন প্রকল্প হাতে না নেয়া– এই উন্নয়ন ব্যয় জনমুখী কোনো ফল দিতে পারবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক সরকারের গৃহীত প্রকল্পসমূহ জনদাবিভিত্তিক (চাহিদা-তাড়িত) হয় না, এগুলো স্বভাবত উপর থেকে আরোপিত প্রকল্প, সরবরাহ-তাড়িত।

এবার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার শিক্ষা খাতকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। খাতটির নাম "শিক্ষা ও প্রযুক্তি"। এই খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট বরাদ্দের শতকরা ১৪.৫ ভাগ। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সুদ পরিশোধে শতকরা ১৩.৫ ভাগ। আর ১৯,২৮৬ কোটি টাকার ঘাটতি মেটাতে সরকার ব্যাংক, বীমা থেকে ঋণ নেয়ার কথা বলেছে। বৈদেশিক ও দেশী ঋণ নির্ভরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সরকারের নেয়া ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের অর্থ বরাদ্দ আগামী বাজেটেই হয়ত

বা বরাদ্দের শীর্ষ অবস্থানে চলে আসতে পারে। আসলে শিক্ষা থেকে প্রযুক্তি আলাদা করা হলে আর শিক্ষা থেকে মূলধারার শিক্ষাকে আলাদা করা হলে দেখা যাবে এবারই ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধই হবে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দের সর্বোচ্চ খাত। এভাবে চলতে থাকলে সরকার উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় ঋণ খেলাপী হয়ে পড়বে। অর্থাৎ উত্তরোত্তর অধিকহারে ঋণের বোঝাটি শেষ পর্যন্ত বইতে হবে এদেশের জনগণকেই, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র-প্রান্তিক-নিস্বিত্ত মানুষ। আমরা আশা করেছিলাম এসব বিষয়ে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণ থাকবে এবারের বাজেটে– কারণ বর্তমান সরকার নির্দলীয়-নিরপেক্ষ। বরাদ্দের তৃতীয় অবস্থানে আছে স্থানীয় সরকার ও গ্রাম উন্নয়ন– শতকরা ৯ ভাগ। চতুর্থ অবস্থানে যোগাযোগ উন্নয়নে– শতকরা ৮ ভাগ। পঞ্চম অবস্থানে স্বাস্থ্যখাতে শতকরা ৬.৮ ভাগ। ষষ্ঠ অবস্থান প্রতিরক্ষা– বরাদ্দ শতকরা ৫.৮ ভাগ। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের মধ্যে ডিফেন্স পরিচালিত সামরিক হাসপাতাল রয়েছে, শিক্ষা খাতে বরাদ্দের মধ্যে ক্যাডেট কলেজে এবং যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টের রাস্তাঘাট উন্নয়ন রয়েছে। এ রকম ব্যয়গুলো সমন্বিত হিসাব করলে প্রতিরক্ষা খাতটি অনেক উপরে চলে আসতে পারে। পার্লামেন্টের জন্য বিগত সরকারের শেষ বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪২ কোটি টাকা। এখন পার্লামেন্ট নেই কিন্তু বেতন-ভাতার জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিগত বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৯ কোটি টাকা আর এবারকার বরাদ্দ ১০২ কোটি টাকা। গত বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ১৪২ কোটি টাকা আর এবার এই বরাদ্দ পৌঁছেছে ৫৩৬ কোটি টাকায়। গত বাজেটের তুলনায় নির্বাচন কমিশনের নিমিত্ত ৩.৮ গুণ বেশি বরাদ্দ থেকে আমরা আশা করতে পারি আসছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যে ২৬,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা গত বছরের তুলনায় ৫০০ কোটি টাকা বেশি। এবারকার এডিপিতে ৯২৭ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮৮৯-টি প্রকল্পই পুরাতন। এ প্রকল্পগুলো প্রণয়নে জনমতের কোনোরকম সংশ্লেষ ছিলো না। জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে (যেমন: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি) বরাদ্দ বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বিচারে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটিও বিচার্য। আর গত অর্থবছরে প্রস্তাবিত এডিপি ছিলো ২৬,০০০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৬০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে আবার প্রথম ৯ মাসে বাস্তবায়ন হার ছিলো মাত্র ৪৫%। এরকম এক অতীত অভিজ্ঞতায় এবারকার এডিপি নিয়েও আমরা যথেষ্ট মাত্রায় শঙ্কিত। **এ শঙ্কা দূর করার কর্মকৌশল চূড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট করতে হবে।**

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ নির্ভরতা

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার ১০,৪০৩ কোটি টাকা বা প্রায় ১৫০ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণের আসল বাবদ পরিশোধ করতে হবে ৪,০৯৮ কোটি টাকা। ফলে নিট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৬,৩০৫ কোট টাকা। চলতি ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের মূল বাজেটে বৈদেশিক ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৯,৬১৮ কোটি টাকা বা প্রায় ১৪০ কোটি ডলার। এর মধ্যে আসল বাবদ পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৫,৮৫৬ কোটি টাকা। তবে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ে ধীরগতি থাকায় সরকার সংশোধিত বাজেটে নিট ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৫,১৮৩ কোটি টাকা নির্ধারণ করছে। সাহায্য-নির্ভর (প্রকৃত অর্থে ঋণ-নির্ভর) অর্থনীতি ভঙ্গুর তো বটেই, এমন অর্থনীতি সরকারি নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতাকেও চরমভাবে ব্যহত করে। আটকে পড়তে হয় ঋণ বাণিজ্যের ফাঁদে। আটকে পড়তে হয় দেশজ উন্নয়ন-প্রতিবন্ধক বিভিন্ন শর্তের ফাঁদে।

অথচ এই বাজেটটি এমন এক সময়ে প্রণীত হলো যখন বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে এবং কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেখান থেকে একটি বিশাল অংকের অর্থ আয়ের পথ তৈরি হয়েছে। বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য কিংবা ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে এই অর্থ দিয়েই বাজেট ঘাটতি পূরণ করা কি সম্ভব হতো না? সরকারের আয় বৃদ্ধির আরো অনেক পথই খোলা আছে যা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। বিভিন্ন উৎসে সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য নিম্নবর্ণিত বেশ কিছু ক্ষেত্রে কর হার পরিবর্তন করা যেতে পারে:

(ক) ব্যাংকিং কোম্পানির ক্ষেত্রে কর হার "ঋণ প্রদান কাঠামো" অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থায়ন বা ঋণ দিলে বেশি হারের কর (৫০-৬০%), আর শিল্পখাতে অর্থায়ন করলে মাঝারি হারে কর (২৫-৩০%), আর ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প, সফটওয়ার ও রপ্তানী শিল্পে অর্থায়ন করলে কম হারে (১৫-২০%) ইত্যাদি।

(খ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রকারভেদে ১০-৪০% কর হার।

(গ) মোবাইল অপারেটরদের বিজ্ঞাপন ও প্রচারে করারোপ।

আমরা আশা কররো চূড়ান্ত বাজেটে এসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।

দ্রব্যমূল্য–বাড়ছে-বাড়বে

দেশের ৮৫-৯০ ভাগ মানুষ নির্দিষ্ট-স্বল্প আয়ের। স্বল্প আয়ের এসব মানুষের ব্যাপকাংশের কর্মসংস্থান ও আয় ঋতু-ভিত্তিক ওঠানামা করে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ

মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধানতম সমস্যা– দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতি। প্রতিনিয়ত দরিদ্র মানুষ হচ্ছে নিঃস্ব, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ যোগ দিচ্ছে দরিদ্রদের কাতারে, মধ্য-মধ্যবিত্ত রূপান্তরিত হচ্ছে নিম্নমধ্যবিত্তে; আর অন্যদিকে গুটি কয়েক ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। মুক্তবাজারের এ এক মাহাত্ম্য; মুক্ত বাজার অর্থনীতি কখনও দরিদ্র-বান্ধব নয়। এবারের বাজেটে দ্রব্যমূল্য সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে জোরালো কোনো কর্মকৌশল বলা হয়নি। আর অর্থ উপদেষ্টা তো নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, দ্রব্যমূল্য কমার সম্ভাবনা কম, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বেশি। অতি মুনাফার প্রলোভন, দুর্নীতি, পদে পদে চাঁদাবাজি ইত্যাদি দমন না করলে এবং মজুদ ব্যবস্থাপনা ও সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক তত্ত্বাবধানের উন্নয়ন করতে না পারলে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে তেমন কোনো ফলপ্রসু অবদান রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে ডাল ও ভোজ্য তেলের উপর শুল্ক প্রত্যাহার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো প্রভাব রাখবে না। অন্যদিকে চাল-গমের আমদানি দ্বিগুণ করা হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেশি থাকার কারণে এ দুটি পণ্যের দাম বাড়বেই। অতএব শুধু শুল্ক হ্রাস কোনো সমাধান নয়; এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। কারণ শুধু শুল্ক হার কমলে এখন আর ভোক্তা স্তরে দ্রব্যমূল্য কমে না– এ কথা তো গত বাজেটে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান স্বীকার করেছেন। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট। এমতাবস্থায় এমনও হতে পারে যে শুল্কহার হ্রাস আমদানি খরচ কমিয়ে দেবে এবং শেষ পর্যন্ত লাভবান হবে মজুতদার, আমদানিকারক। তাছাড়া জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে বাড়বে পরিবহন ব্যয় এবং কৃষির উৎপাদন ব্যয়– ফলে বাড়বে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের দাম। বাজার বিশ্লেষণ করে এমন সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে প্রচলিত প্রক্রিয়ায় দ্রব্যমূল্য বাড়তেই থাকবে। কারণ (১) মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট অত্যন্ত সংগঠিত– অতীতে এ সিন্ডিকেট ছিল পৃথকভাবে আমদানি, কৃষি বহির্ভূত উৎপাদন, মজুদ, কৃষির উৎপাদন বাজারজাতকরণ, এবং কৃষির উৎপাদনী উপাদান পর্যায়ে, আর এখন পঞ্চভূজের পাঁচ বাহু এক বাহুতে মিলেমিশে আছে, (২) মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম কমবে না, (৩) সম্পূরক শুল্ক বহাল থাকবে, (৪) ঘাটতি বাজেট মেটাতে অভ্যন্তরীণ ঋণ বাড়বে যার বোঝা চাপবে জনগণের ঘাড়ে, (৫) সরবরাহ-চেইন ভেঙ্গে পড়েছে, (৬) সরকারি গো-ডাউনে প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত নেই (গত সরকারের শেষ বছরে পরিস্থিতি আরো খারাপ ছিলো), (৭) সরকারি সরবরাহ সিস্টেম-রেশনিং ব্যবস্থা কার্যকর নয়, (৮) আন্ত-মন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, (৯) বাজার চাহিদা-সরবরাহ মনিটরিং-এর দুর্বলতা, (১০) আন্তর্জাতিক বাজারে বিরূপ পরিস্থিতি।

এসব বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে শহর-গ্রাম সর্বত্র যথাযথ আইনী কাঠামোয় তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিক নির্দেশনা চূড়ান্ত বাজেটে থাকা বাঞ্ছনীয়।

চিনি কেনো তেতো হচ্ছে?

চিনির মূল্য নিয়ে তেলেসমাতি ঘটছে গত ক'বছর ধরেই। এমনকি শক্তিশালী সিণ্ডিকেট আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে গত বছরই চিনির মূল্য বাড়াতে বাড়াতে নিয়ে তোলে কেজি প্রতি ৭০ টাকায়। অথচ, এবার আবার শুল্ক বসানো হলো চিনির ওপর। বিশেষ করে, প্রস্তাবিত বাজেটে অপরিশোধিত চিনির ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করায় নতুন হুমকির মুখে পড়লো বেসরকারি চিনি পরিশোধন (রিফাইনারি) শিল্প। প্রস্তাবিত বাজেটে বলা হলো যে দেশের পাঁচ লাখ আখ চাষী আর স্থানীয় চিনি শিল্পের সমস্যা বিবেচনায় এবং অপরিশোধিত চিনি সংক্রান্ত অসত্য ঘোষণা রোধ কল্পে ২,২৫০ টাকা বিদ্যমান শুল্ক বৃদ্ধি করে ৪,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ বেসরকারি মিল মালিকরা জানাচ্ছেন 'র' সুগার জাহাজের মাধ্যমে ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও আফ্রিকা থেকে আমদানি করতে হচ্ছে– ফলে আন্তর্জাতিক বাজারদর, জাহাজ ভাড়া ইনস্যুরেন্সসহ সিএন্ডএফ-এর মূল্য টনপ্রতি ৩১০ থেকে ৩২০ মার্কিন ডলার পড়ছে। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে প্রকৃত আমদানি ব্যয় আরও বাড়বে । অথচ ফিনিশড সুগার আমাদানিকারকরা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে কমমূল্যে (যেহেতু, তারা আন্তর্জাতিক বাজারদর অনুসরণ না করে কমমূল্যে নিম্মানের চিনি স্থলপথে প্রেরণ করতে পারছে এবং রপ্তানিকারকরা ভর্তুকি পাচ্ছে ৫০ ভাগ) চিনি বাংলাদেশে আনতে পারবে। আবারও, সিন্ডিকেট তৈরির পথ সুগম হবে, ঝুঁকির মুখে পড়বে বেসরকারি চিনি পরিশোধন শিল্প। লক্ষণীয় যে, বাজেট বক্তৃতার পরদিনই বাজারে কেজিপ্রতি চিনির মূল্য ৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ টাকায় পৌছে গেছে। **বিষয়টি পূণর্বিবেচনার/সমন্বয় সাধনের দাবি রাখে।**

কৃষি প্রসঙ্গ

আপাত দৃষ্টিতে বাজেটে কৃষি প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে বলেই মনে হয়। বেড়েছে বরাদ্দ, রয়েছে ভর্তুকি। কৃষি খাতের ভর্তুকি চলতি অর্থবছরে মূল বাজেটের ১,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বিবেচনায় আনলে ভর্তুকির পরিমাণ ৪১ কোটি টাকা কমে গেছে। ক'দিন আগেই আমরা শুনলাম "ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি কৃষি পণ্যের উৎপাদন বা পরিবহন খরচকে প্রভাবিত করবে না, কারণ জ্বালানী খরচ মোট খরচের মাত্র ৩%", অথচ বাস্তব হচ্ছে বোরো উৎপাদনে ডিজেল এর মূল্য বৃদ্ধিতে খরচ বেড়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এজন্য অবশ্য, বাজেটে কৃষকের জন্য সেচকাজে ব্যবহৃত ডিজেলে বর্দ্ধিত খরচের সমপরিমান (অর্থাৎ কেজিপ্রতি উৎপাদনে ৫০ পয়সা) ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা। বলা হয়েছে এই ভর্তুকি পাবে

কার্ডধারী কৃষক। তবে কার্ডধারী কৃষক কারা বা কোন কৃষক কার্ড পাবেন বাজেট বক্তৃতায় সে সম্পর্কে কিছু বলা হলো না। আমরা তাই, 'ঘরপোড়া গরুর মত' 'সিঁদুর' দেখেই শঙ্কিত হয়ে পড়ছি। কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি-গবেষণায় ৩৫০ কোটি টাকার তহবিল গঠনের প্রস্তাব ভালো উদ্যোগ- তবে সামাজিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে মামুলি গবেষণা আমাদের তেমন কোনো ফল দেবে না। কৃষি গবেষণা খাতে ৩৫০ কোটি টাকার এন্ডাওমেন্ট তহবিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু ২০০৭-০৮ সালের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। আর পরবর্তী বছর থেকে এন্ডাওমেন্ট তহবিল তেকে ৩৫ কোটি টাকার মত আসতে পারে। এই পরিমাণ অর্থ খুবই সামান্য। এণ্ডাওমেন্ট তহবিলটিও কৃষি জিডিপির ১ শতাংশের কম। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতেও এই খাতে বরাদ্দ কৃষি জিডিপির ৫ শতাংশ। বিশেষ করে শস্য খাত (একই ফসল বার বার একই জমিতে চাষ এবং সারের সুসমন্বিত ব্যবহারের অভাবের কারণে) যা ক্রমাগতভাবে জমির উর্বরতা হ্রাস করে এবং বন্যা-খরা ও আবহাওয়া পরিবর্তনে খাপ খাওয়াতে যোগ্য ফসলের প্রসারসহ অন্যান্য সমাধানের লক্ষ্যে কৃষি গবেষণায় অনেক বেশি জোর দেয়া উচিত। তাছাড়া আমরা প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। এমতাবস্থায় কৃষি গবেষণায় সুচিন্তিত বরাদ্দ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর আমাদের জনসংখ্যা যখন বাড়ছে ১.৫৪ শতাংশ হারে তখন ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাসের জন্য এই খাতে ব্যপক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বরাদ্দ প্রকৃত কৃষকের হাতে পৌছানো অত্যন্ত জরুরী। সেই সাথে একথা স্বীকার করে এগুতে হবে যে গ্রামাঞ্চলে ৬০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন; ভূমিহীন এসব মানুষ ভর্তুকিসহ কৃষি-খাত বরাদ্দের কতটুকু পাবেন, কিভাবে পাবেন? **এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কৃষিখাতের উন্নতিকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। বিশেষ করে কৃষি গবেষণায় আগামী বছরে ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।**

ঝুঁকির মুখে দেশীয় শিল্প

এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে শুল্কস্তর আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০%, আমদানিকৃত মধ্যবর্তী পণ্যের উপর ১২% থেকে বাড়িয়ে ১৫%, এবং আমদানিকৃত প্রস্তুত পণ্যের উপর ২৫%-এ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সকল আমদানি পণ্যের ওপর থেকে উন্নয়ন সারচার্জ ৪% প্রত্যাহার করা হয়েছে। VAT ও উৎসের কর সকল ক্ষেত্রে অপরিবর্তীত থাকায় কাঁচামালে শুল্ক ১% বাড়ছে, মধ্যবর্তী পণ্যে শুল্ক ১% কমছে এবং প্রস্তুত পণ্যে ৪% কমছে। কাজেই তুলনামূলকভাবে প্রস্তুত পণ্যের আমদানি খরচ কমে যাবে। ফলে দেশে উৎপাদন ব্যহত হবে এবং প্রস্তুত পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পাবে। পণ্যের ক্যাটাগরি বিশ্লেষণে দেখা যায় উন্নয়ন কর কমানোর ফলে অন্তত ২,৬০০

পণ্যের আমদানি ব্যয় কমবে, যার অধিকাংশই গরিব মানুষের উপকারে আসবে না। এ সবের মধ্যে রয়েছে এমনকি গাড়ি, পানীয়, প্রসাধনী এবং দামি পোশাক। ৫% থেকে ১০% প্রস্তাবিত শুল্ক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১,২০০ পণ্য, যার মধ্যে আছে শিল্প কাঁচামাল ও উৎপাদনী যন্ত্রপাতি। শূন্য শুল্ক উঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে প্রায় ৪০০ পণ্যের, যার মধ্যে আছে শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি। এমনকি টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট শিল্পের মেশিনারিজের ওপর থেকে পর্যন্ত শূন্য শুল্ক সুবিধা উঠিয়ে নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আবার কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক আরোপিত হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত দেশজ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হবে। সবমিলিয়ে বিকৃত মুক্তবাজারকে বিকৃততর করার নব্য উদারতাবাদভিত্তিক মুক্ত বাজার ফর্মূলা ছাড়া এসবকে আর কী-ই বা বলা যায়।

সুতরাং দেশের বাস্তবতার আলোকে শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে দেশজ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আবহ ও কাঠামো বিনির্মাণ করা বাঞ্চনীয়।

তেল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ–সংকট কমবে না

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতিকে নানান সংকটে ফেলেছে এ কথা সত্যি। এমতাবস্থায় জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া গেলেও বাজেটে এই অভিঘাতকে সহনশীল মাত্রায় নিয়ে আসবার কার্যকরী কৌশলের কথা অনুপস্থিত। জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের পরিবহন খাতে পারিবারিক ব্যয়সহ জ্বালানি তেল-ভিত্তিক পণ্যের উপর এবং ফলে দেশের বিভিন্ন মানুষের জীবন যাত্রায় কি প্রভাব/অভিঘাত ফেলবে এ সম্পর্কে বাজেটে বিশ্লেষণাত্মক নির্দেশনা নেই।

গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহারে জ্বালানি নির্ভরতা কমানোর জন্য বরাদ্দের কথা উল্লেখ নেই বাজেটে। বাজেটে গ্যাস উত্তোলন এবং বিতরণ নিয়ে কোনো মন্তব্যই নেই।

আমাদের দেশের মাত্র ৩৫ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। এ নিয়ে গ্রাম-শহরের প্রভেদ আছে; অধিকাংশ বিদ্যুৎ সুবিধা শহরে গণ্ডিবদ্ধ। বিদ্যুৎ-প্রাপ্তি আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ১৩৯ কিলোগ্রাম (অয়েল ইকুইভ্যালেন্ট)। অথচ সার্কভুক্ত নেপালে ৩৫৮ কিলোগ্রাম, শ্রীলংকায় ৪০৬ কিলোগ্রাম, পাকিস্তানে ৪৪৪ কিলোগ্রাম, ভারতে ৪৮২ কিলোগ্রাম। **উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎপ্রাপ্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করতে হবে অর্থাৎ শিল্প-ব্যবসা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মাথাপিছু বিদ্যুৎপ্রাপ্তি দ্রুত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।** বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে কিন্তু এই বরাদ্দ ব্যবহারের

নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন ছিল। অতীতে বাজেটে বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। হাজার হাজার কিলোমিটার বিদ্যুৎ নেই খাম্বা আছে। তাই এই বিষয়টি (লুটপাটের) গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ দিক নির্দেশনার দরকার ছিল। দেশের ৬৫ ভাগ খানায় এখনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই অথচ বলা হচ্ছে "২০২০ সালে সবার জন্য বিদ্যুৎ"। সেই সাথে মনে রাখা প্রয়োজন যে সবার জন্য বিদ্যুৎ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গিকার। এ কথাও প্রমাণিত যে বিদ্যুতে ব্যাপক জনগোষ্ঠির অভিগম্যতা ছাড়া জাতিসংঘের 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা' (UN-MDG) অর্জন হবে না। বাজেটে MDG নিয়ে কথা আছে, তবে জনগণের বিদ্যুৎ প্রাপ্তির সাথে MDG -র সম্পর্কের কোনো কথাই নেই।

দীর্ঘমেয়াদী দিক নির্দেশনা ছাড়াও আগামী বছরে দ্রুত যা করণীয় তা হচ্ছে পুরোনো বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির দ্রুত সংস্কার এবং যথাযথ load management যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং প্রাপ্ত বিদ্যুতের সুব্যবহার নিশ্চিত হয়। এ লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজন যথাযথ দুর্নীতিমুক্ত পদক্ষেপ।

দারিদ্র বিমোচন– এখনও বুলিসর্বস্ব

সরকারি ভাষ্যে বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতিই বর্তমানে চালিত হচ্ছে 'দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র'-এর ভিত্তিতে। দারিদ্র বিমোচন সেক্ষেত্রে আমাদের বাজেটে প্রাধান্য পাবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে যে প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে তা কি বাস্তবে কার্যকর হবে? যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কোনখাতে কতটুকু বরাদ্দ, কোন সময় বরাদ্দকৃত অর্থ কতটুকু ব্যবহার হবে, এতে কতটুকু ফলাবর্তন ঘটবে তার সুনির্দিষ্ট কোনো হিসেব-পত্তর বাজেটে নেই। দারিদ্রের বহুমুখী স্বরূপ, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বর্তমান সংখ্যা এবং প্রক্ষেপিত সংখ্যা বলা হয়নি বাজেটের কোথাও। কোথাও বলা হয়নি কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কত সময়ের মধ্যে কতটুকু দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূর হবে এবং কল্যাণ নিশ্চিত হবে। সময়ভিত্তিক কোন প্রক্ষেপণ তো একেবারেই অনুপস্থিত। গত কয়েক বছর ধরেই মোট বাজেটের ৫০ শতাংশের উপর দারিদ্র বিমোচনে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে বলে বলা হয়, অথচ দারিদ্র পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। এবারের বাজেটে দারিদ্র নিরসনে মোট বরাদ্দের শতকরা ৫৭ ভাগ বরাদ্দ প্রদানের কথা বলা হলেও হিসেবটা কেমন করে কষা হলো তা পরিষ্কার করা হয়নি এবং এই ব্যয়ের ক্ষেত্র ও কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। আর দারিদ্র বিমোচনে সাফল্য শুধুমাত্র বরাদ্দ বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে না, এসব বরাদ্দের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে বরাদ্দ বৃদ্ধি আর বরাদ্দের সদ্ব্যবহারও শেষ কথা নয়– দারিদ্র সৃষ্টির উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে আর তার জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

করা, শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা আর সুশাসন নিশ্চিত করা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা ভিত্তিক দারিদ্রের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হলে আগামী দশ বছর সময়ে বছরে ৪.৫ শতাংশ হারে দারিদ্র কমিয়ে আনতে হবে। অথচ আমাদের দেশে বর্তমান প্রবৃদ্ধি সরকারি হিসেবে ৭ শতাংশে উন্নীত হলেও (যার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতিত নয়), বিগত ৫ বছরে সরকারি হিসেবে দারিদ্র কমেছে বছরে মাত্র ১.৬ শতাংশ হারে। এভাবে দারিদ্র কমতে থাকলে সংবিধানে বিধৃত মৌলিক চাহিদার নিরিখে দারিদ্র দূর কবে হবে তা কেউই জানে না। এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশে উন্নয়ন সূচক গুলোর সার্বিক যে বেহাল অবস্থা তাতে দারিদ্র হ্রাসের বিষয় হবে সুদুরপরাহত। এমতাবস্থায় বাজেটে দারিদ্র হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়াদি যথেষ্ট মাত্রায় বুলিসর্বস্ব। দারিদ্র হ্রাস বিষয়টি এখনও বাস্তবসম্মত এ জন্যও যে দারিদ্রের বিভিন্ন রূপ বাজেটে স্বীকৃতি পায়নি। যেমন, আয়ের দারিদ্র, পরিভোগের দারিদ্র, মজুরী স্বল্পতার দারিদ্র, কর্মহীনতার দারিদ্র, শিক্ষার দারিদ্র, স্বাস্থ্যের দারিদ্র, আবাসনের দারিদ্র, অস্বচ্ছতা উদ্ভুত দারিদ্র, পরিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র, যুব দারিদ্র, শিশু-শ্রম উদ্ভুত দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতার দারিদ্র, রাজনৈতিক দারিদ্র, মানস-কাঠামোর দারিদ্র ইত্যাদি। দ্রুত টেকসইভাবে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে দারিদ্রের আসল বহুমুখী চেহারা ব্যাপ্তি ও গভীরতা বিবেচনায় নিয়ে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য দারিদ্রের যাতাকল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ জরুরিভিত্তিতে নিতে হবে। **চূড়ান্ত বাজেটে সেই লক্ষ্যে নীতি, কৌশল ও পদক্ষেপের বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়।**

কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত

সরকার যেসব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে সেসব মন্ত্রণালয়ের অনেকেরই বাজেট কমেছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কমানোর ফলে সরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথ সীমিত হবে। গত বছরের মত এবারের বাজেটে বলা হয়েছে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে এবারের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর কর্মসংস্থান যেখানে দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম কৌশল সেখানে বাজেটে এ বিষয়ে সাংবিধানিক বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ হিসেবপত্তর থাকা প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে ২০ লক্ষ মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে তার মধ্যে অধিকাংশ মানুষের কর্মসংস্থান হয় না। এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ বরাদ্দের কথা বলা হলেও সেভাবে বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেকারত্ব সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর কোন দিকনির্দেশনা বাজেটে নেই। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের কাঠামোগত কোনো বিন্যাসও বাজেটে পরিলক্ষিত হয়নি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি–কোথায়, কার মাধ্যমে, কোন প্রক্রিয়ায় হবে তার কোনো স্পষ্ট-স্বচ্ছ কর্মকৌশল বাজেটে নেই।

যুব বেকারত্ব এই সময়ের একটি বিশাল ইস্যু। সরকার কর্মসংস্থান খাতে ৩,৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেও সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি দেয়নি। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নৈতিক মূল্যবোধনির্ভর সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলছে। সেটি করতে হলে যুব বেকারত্ব নিরসনে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে যথেষ্ট গভীরভাবে ভাবা উচিত ছিল। ফলে এই যুবকদের নানানভাবে অপ-ব্যবহারের সুযোগ কমে আসত। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে ভিত্তি করে বাজেট রচনা করতে হলে বাজেটের কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থাৎ কর্মসংস্থান কোন খাতে কত সৃষ্টি করা হবে তা নির্ধারণ করে সেই আলোকে খাতওয়ারী বরাদ্দ বিন্যাস করতে হবে। এবারের বাজেটে তা হয়ত সম্ভব হবে না। **তবে কর্মসংস্থান (স্ব ও মজুরীর বিনিময়ে)– বিশেষ করে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য– সৃষ্টি ব্যাপকতর করা এবং কিভাবে তা ঘটবে সেই বিষয়ে প্রস্তাবনা ও বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে থাকা জরুরি।**

খাদ্য নিরাপত্তা– কৌশল যথেষ্ট নয়

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বাজেটে নিশ্চিত করা হয়নি। দরিদ্রের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৮০০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হলেও এই অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং এই অর্থ ব্যয়ের যথার্থ কৌশলও নেই। সার ও কীটনাশক খাতে ১,৫০০ কোটি টাকার ভর্তুকি ব্যয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় এই অর্থ অতীতের রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো ব্যয় হয় কিনা সে শংকামুক্ত হওয়াও দুষ্কর। আবার এ সম্ভাবনাও পুরো মাত্রায় থাকবে যে ভর্তুকির বৃহৎ অংশ চলে যাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে। সরকার বাজেটে খুব বেশি কিছু না করে কয়েক হাজার কোটি টাকার মোটা চাল কিনে (১০-১৫) টাকা সের-এ দরিদ্র/নিস্বিত্তদের জন্য বাজারে সরবরাহ করলে মানুষ বেশি উপকৃত হবে।

সামাজিক সুরক্ষা

সুখের কথা যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার আওত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ খাতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বরাদ্দ হয়েছিল মোট বাজেটের ৮.৩৭ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের জন্য এ খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১০.৫৮ শতাংশ। এটি প্রশংসনীয়। তবে যতটুকু প্রয়োজন ছিলো সে তুলনায় এ বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। উপকারভোগীর নিরঙ্কুশ সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু এখনো কমপক্ষে ৫০ শতাংশ দরিদ্র প্রবীণকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়নি বিভিন্ন ধরণের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষকে। সামাজিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র ভাতার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে না, এ

বিষয়ে বৃহত্তর বিবেচনা প্রয়োজন। এবারের বাজেট অতীতের তুলনায় নারী ও শিশুর প্রতি কিছুটা সংবেদনশীল এ কথা সত্য। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থানই সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান পথ। **এ জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিশেষত দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জন্য অঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচি এবং বরাদ্দ হবে সুবিবেচনা প্রসূত।**

এক বছরের বাজেট তবে দূরদৃষ্টির অভাব

বাজেটে এক বছরের কার্যক্রম বরাদ্দ থাকলেও আসলে তা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দর্শনের কৌশল নির্দেশ করে। এ নিরিখে এবারের বাজেট অতীতের বাজেটের মতই সীমিত। এ বারের বাজেটে বাজেট পূর্ব আমরা জনকল্যাণকর যা কিছু সুপারিশ করেছিলাম তা তেমন স্থান পায়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাজেটে যা নেই তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো:

১) ভবিষ্যতে উৎপাদনশীল কর্মযজ্ঞসহ দেশজ শিল্প বিকাশ কিভাবে হবে এবং এ বাজেট তা কিভাবে তরান্বিত করবে?

২) বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র কিভাবে, কখন, কত বছরে দূর/হ্রাস হবে?

৩) কর্মসংস্থান সৃষ্টি– কোথায়, কার মাধ্যমে, কোন প্রক্রিয়ায় হবে? আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিকাশের পরিকল্পনা কি?

৪) মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য–কেমন করে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আসবে?

৫) মনুষ্যসৃষ্ট পাহাড় ধসসহ জলাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে শতবছরের পুঞ্জীভূত সম্পদ যে এক নিমেশে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে– এ বিষয়ে উন্নয়ন কৌশলের দলিল হিসেবে বাজেট ভাবনাটা কি?

৬) বিজ্ঞানীরা বলছেন যে প্রধানত উন্নত বিশ্বের বিশ্বায়নের কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া-জলবায়ু এমনভাবে পরিবর্তীত হচ্ছে যার ফলে মোটামুটি নিকট ভবিষ্যতে মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উপকূলীয় অংশ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। উন্নয়ন কৌশলের দলিল হিসেবে এ নিয়ে বাজেটে কি কিছুই বলার নেই?

৭) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিষয়ে কোনো বক্তব্য-নির্দেশনা নেই?

৮) তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানোর সর্বোত্তম পন্থা কি– শুল্ক বাড়িয়ে কি তা সম্ভব?

আমাদের সারকথা

বিশ্বায়নের যুগে বাজার অর্থনীতির রথে সারা বিশ্ব আজ সহযাত্রী। এই রথ বিশ্বসম্পদ, বিশ্ববাণিজ্য, এবং পারস্পারিক বিশ্ব-নির্ভরতাকে নিয়ে গেছে এক অভূতপূর্ব চূড়ায়। কিন্তু বিশ্ব দারিদ্র্য থেকে গেছে ব্যাপক এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। বাংলাদেশও বিশ্বায়নের রথযাত্রায় সহযাত্রী। কিন্তু এই যাত্রাপথ মসৃণ নয়, বিপদসংকুল। তদুপরি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এক ভয়াবহ পরিণতির ইংঙ্গিত বহন করে। পরিবেশের সুব্যাবস্থা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির বিকাশই হচ্ছে সঠিক পথ। দারিদ্র্য-বঞ্চনায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, জর্জরিত। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-বঞ্চনা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে সংঘাত বাড়বে বই কমবে না। তাই উন্নয়নদর্শনে শুধু বক্তৃতায় নয় কার্যকর জনমুখী সংস্কার জরুরী। আর তার মূল মন্ত্র হবে বিরাজমান ও বিকাশমান অ-টেকসই বাস্তবতার বিপরীতে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সরকারের সকল কর্মকান্ডে বৈষম্য–নিরসনমূখী কার্যক্রম অগ্রাধিকার পেতে হবে। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অবসান ঘটিয়ে সরকারি সেবা সাধারণ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের সকলস্তরে জন-অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তণ করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে মানুষ। আর এ উন্নয়ন বাজার ব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমেই ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রয়োজন যথাযথ ভারসাম্যমূলক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায়নীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে বেসরকারি খাতের বিকাশে সহায়তা ও উৎসাহদানকারী আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরী করা। জনকল্যাণধর্মী জনঅংশীদারিত্ব ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাই উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে উন্নয়নদর্শন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকারের ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
ড. আবুল বারকাত **

ভূমিকা

গত ১১ জুন ২০০৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে ২০০৯-১০ অর্থবছরের ৩৬৫ দিনের জন্য ৩৬৫ পয়েন্ট সম্বলিত বাজেট পেশ করলেন। বর্তমানে সরকার জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত একটি সরকার। জনগণের এ ম্যান্ডেট-এর সাথে অতীতের ব্যর্থতার-অনাস্থার যেমন সরাসরি সম্পর্ক আছে তেমনি সরাসরি সম্পর্ক আছে বর্তমান সরকারের মূল রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদেয় জনকল্যাণকামী প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের। যে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নিহিত আছে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে।

জনগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী নাগাদ সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হয়ে উঠুক একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার-গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রে (যা ইশতেহারে "রূপকল্প ২০২১" হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে)। সেই সাথে নির্বাচনী ইশতেহারে যে পাঁচটি বিষয়কে– দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখা (মহামন্দার প্রভাব মোকাবেলাসহ), দুর্নীতি দূর করা, বিদ্যুৎ-জ্বালানী সমস্যার সমাধান করা, দারিদ্র ঘুচাও-বৈষম্য রুখো, এবং

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত, প্রেস কনফারেন্স, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, ২ আষাঢ় ১৪১৬/১৬ জুন ২০০৯

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা– অগ্রাধিকার বলে বিবেচনা করা হয়েছিলো; আর সেই সাথে ইশতেহারে যে ২২টি সময়-নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো– জনগণ এসবের প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাসে বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা রেখে নির্বাচনী ম্যান্ডেট দিয়েছে। সুতরাং যুক্তিগতভাবেই বাজেটসহ সরকারের সকল কর্মকাণ্ড হতে হবে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত দিন বদলের সনদ অভিমুখী। বাজেট বিশ্লেষণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে আমরা এসব বিবেচনা মুখ্য বলে মনে করি। সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমরা একথা বার বার স্মরণ করাতে চাই যে, "শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে" এবং এবার যারা জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তারা প্রকৃত অর্থে জনগণকে সাথে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছেন। সুযোগটি জনগণের প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখিয়ে, জনগণের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে, জনগণকে সাথে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টির সুযোগ।

এবারের বাজেটের প্রতি জনপ্রত্যাশা

এবারের বাজেট অনেক দিক থেকেই ভিন্নধর্মী হবার কথা। কারণ বর্তমান নির্বাচিত সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা সংগতকারণেই অনেক। আর সেই সরকারেরই এটা প্রথম বছরের বাজেট। এবারের বাজেট প্রথাগত ধ্যান-ধারণার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না– এ আশা ছিল সবার। সম্ভবত এ কারণেই অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার শেষ দিকে বলেছেন "এ সরকারের প্রথম বাজেট হবে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সূচনা" (পৃ: ৯৭)। বাজেট যে শুধুমাত্র আগামী এক বছরের জন্য সরকারের ব্যয়-বরাদ্দেরই হিসেব-পত্তর নয় বরঞ্চ ভবিষ্যত দিক-নির্দেশক দলিল– এবারের বাজেটে এ বিষয়টি মোটামুটি স্পষ্ট করার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। সে কারণেই প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করতে ভোলেন নি 'রূপকল্প ২০২১' এর অন্তর্নিহিত বিষয়টি এবং মধ্যমেয়াদের চিন্তাভাবনা। সুতরাং এবারের বাজেটের একটি স্বকীয় দর্শন-ভিত্তি আছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে বাজেট নিচ্ছিদ্র, নিখুঁত এবং আলোচনা-সমালোচনার উর্দ্ধে।

অর্থনৈতিক সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়নের দলিল হিসেবে এবারের বাজেট কাঠামোগতভাবেই প্রথাগত সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বাজেট প্রণয়নে মূল ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে জনগণের কাছে দেয়া সেসব প্রতিশ্রুতিকে যা গত নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহার "দিন বদলের সনদ"-এ স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল। আর সে কারণেই বলা যায় যে, এ বছরের বাজেটে বর্তমান সরকার জনগণকে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিয়েছেন। যা জনগণের ইচ্ছার প্রতি সরকারের বিশ্বস্ততার ও জবাবদিহিতার এক ধরনের লক্ষণ-নির্দেশক।

বাজেটে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের স্বীকৃতি

এবারের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী কয়েকটি মৌলিক বিষয় স্বীকার করেছেন (যা অতীতে খুব একটা করা হয় নি)। এসব মৌলিক স্বীকৃতি জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতাসহ 'দিন বদলের সংস্কৃতি'র পরিচায়ক।

১. "বাজেটকে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটে বিভক্তিকরণ মূলত: কৃত্রিম" (পৃ: ২১)।

২. "অধিকাংশ সরকারি ব্যয়ই সরকারের জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতির সাথে যথাযথ সম্পর্কযুক্ত থাকে না। থাকে না এ সম্পদ ব্যবহার করে কাঙ্খিত কী ফলাফল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনাও" (পৃ: ১৯)।

৩. "পাঁচসালা পরিকল্পনা (২০১০-১৫) হবে সরকারের উন্নয়ন দিগদর্শন এবং জাতির জন্য ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা (পৃ: ১৬)।

৪. "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজেট বাস্তবায়ন যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয় না" (পৃ:১৯)।

৫. "বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় থাকে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈত্বতা (পৃ: ২১)।

৬. "কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত জাতীয় বাজেটে জেলা অথবা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। আমরা বলতে পারি না কী পরিমাণ সরকারি অর্থ একটি নির্দিষ্ট জেলায় ব্যয় হচ্ছে" (পৃ: ২২)।

৭. "খাত/মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী নারী উন্নয়ন-নিমিত্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা জরুরি" (পৃ: ২১)।

৮. "বিশ্বমন্দার এ পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি" (পৃ: ২৫)।

৯. "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন সব সময়েই দুর্বল" (পৃ: ২৬)।

১০. "আমাদের উন্নয়ন প্রয়াস বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির দ্বারা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত" (পৃ: ৩৫)। "পল্লী বিদ্যুতের উন্নয়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করে" (পৃ: ৩৭)। "পল্লী বিদ্যুতায়ন সামষ্টিক রূপকল্প অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার" (পৃ: ৩৪)।

১১. "কেবল শিল্প খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমেই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সম্ভব" (পৃ:৩৯)।

১২. "বাংলাদেশে cost of doing businees এখনও অত্যন্ত বেশি" (পৃ: ৪০)।

১৩. "সচেতন সরকারি হস্তক্ষেপহীন মুক্তবাজার অর্থনীতি টেকসই নয়" (পৃ: ৪১)।

১৪. "যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বিত নয়" (পৃ: ৪২)।

১৫. "গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ" (পৃ: ৪৩)।

১৬. "ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সুবিধাদি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে" (পৃ: ৪৫)।

১৭. "মানুষের চয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে দেয়" (পৃ: ৪৮)।

১৮. "শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য" (পৃ: ৪৯)।

১৯. "সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস" (পৃ: ৫৪)।

২০. "কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রকট দারিদ্রপীড়িত এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসৃজনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব" (পৃ: ৫৯)।

২১. "জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচন" (পৃ: ৬০)।

২২. "জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুত হবার ফলে মৌলিক কৌশল হিসেবে বিশ্ব নাগরিকের প্রবাসনে যাবার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি" (পৃ: ৬২)।

২৩. "সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার আওতায় আনা" (পৃ: ৬৩)। "দেশের হাজার হাজার অচিহ্নিত গণকবর চিহ্নিত করা" (পৃ: ৬৪)।

২৪. "অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সুষম উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন" (পৃ: ৬৬)।

২৫. "জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ" (পৃ: ৬৬)।

২৬. পররাষ্ট্র নীতিতে "অর্থনৈতিক কূটনীতি হবে কেন্দ্রীয় কৌশল" (পৃ: ৬৭)।

২৭. "আর্থিক খাত সংস্কার ও পুঁজিবাজার সংস্কার" (পৃ: ৬৯-৭১)।

২৮. "নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে টিসিবি শক্তিশালীকরণ" (পৃ: ৭২)।

২৯. "জনপ্রশাসন সংস্কার অপরিহার্য" (পৃ: ৭৩)।

৩০. "যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসিকিউটর দফতর প্রতিষ্ঠা" (পৃ: ৭৬)।

৩১. "সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর ওপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ-পরিকল্পনা" (পৃ: ৭৬)।

৩২. "অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হ'ল দুর্নীতি। দুর্নীতি দুর না হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে না" (পৃ: ৭৭)।

৩৩. "দুর্নীতি, অনিয়ম ও অদক্ষতা দূর করতে সরকারি ক্রয়, প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ, টেণ্ডার এবং সমাপ্ত প্রকল্পের মান যাচাইয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা" (পৃ: ৭৭)।

৩৪. "দেশে উন্নয়নমুখী একটি সংহত শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার অন্যতম হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোই থাকবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে। ....আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে চাই" (পৃ: ৭৮-৭৯)।

৩৫. "শুল্ক ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে...। আমরা স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ ও বাণিজ্য উদারীকরণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে চলতে চাই। ....রাজস্ব ঘাটতি পূরণে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।.... আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আহরণ বাড়াতে হবে" (পৃ: ৮০-৮০)।

৩৬. "আমাদের কর ব্যবস্থা অত্যন্ত অব্যাহতি বহুল (exemption-ridden)" (পৃ: ৮১)।

প্রস্তাবিত নূতন কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপসমূহ

১. রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (পৃ: ৩৭)

২. আর্সেনিক মুক্ত পানির উৎস নির্মাণ (পৃ: ৩৩)

৩. একটি বাড়ী একটি খামার (পৃ: ৩২)

৪. ভেড়া ও মহিষের খামার স্থাপন (পৃ: ৩০)

৫. প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে PPA, PPR সংশোধন বিবেচনা এবং পরিবীক্ষণ শক্তিশালীকরণ (পৃ: ২৬-২৭)

৬. নারীর জন্য বরাদ্দে স্পষ্টতা ও ইতিবাচক পদক্ষেপ (affirmative action) (পৃ: ২২)

৭. জেলাওয়ারী বাজেট ধারণা (পৃ: ২২-২৩)

৮. তিন খাত ভিত্তিক PPP : কারিগরি সহায়তা খাত, বীজ–অর্থায়ন (viability gap funding), অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল (পৃ: ১৮-১৯)

৯. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠন (পৃ: ৩৯)

১০. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তারা অগ্রাধিকার পাবেন: মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫% এবং সুদের হার ১০% (পৃ: ৪২)

১১. পদ্মা সেতু ও (কর্ণফুলীতে) ঝুলন্ত সেতুর বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার; টঙ্গি ভৈরববাজার পর্যন্ত রেলওয়ের ডাবল লাইন নির্মাণ; নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন; ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, তেজগাঁও থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত টানেল, ঢাকার চারপাশে সার্কুলার রেল স্থাপন, ঢাকা ইস্টার্ন বাইপাস– এসবের সম্ভাব্যতা যাচাই (পৃ: ৪২-৪৫)

১২. পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্র উপবৃত্তি চালু করা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি (পৃ: ৪৮)

১৩. প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলা গ্রোথ সেন্টার কেন্দ্রিক পল্লী নিবাস ও শহরাঞ্চলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসন গড়ে তোলা হবে (পৃ: ৪৭)

১৪. অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংস্থান এবং শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য সেন্টার হোম নির্মাণ (পৃ: ৪৭)

১৫. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার মোট ছাত্রসংখ্যার ৪০% থেকে বাড়িয়ে ১০০%-এ উন্নীত করা। অতি দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (পৃ: ৪৯-৫০)

১৬. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন (পৃ: ৫১)

১৭. কৃতি গবেষকরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রণোদনা-প্রস্তুতি (পৃ: ৫২)

১৮. সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য নীতি নবায়ন ও জাতীয় ওষুধ নীতি (২০০৫) যুগোপযোগিকরণ (পৃ: ৫৩-৫৪)

১৯. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি (পৃ: ৫৫-৫৮)

২০. বেকার যুবকদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন (পৃ: ৫৭)

২১. পথশিশুদের নিরাপত্তা আবাসন হিসেবে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন (পৃ: ৬১)

২২. তরুণ প্রজন্মকে পঠনমনস্ক করার লক্ষ্যে সর্বত্র গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলা (পৃ: ৬৫)

২৩. Tax Information Management and Research Centre গঠন (পৃ: ৮৩)

২৪. ২০১২ সালের পরে বিদ্যমান কর অবকাশ ব্যবস্থা প্রলম্বিত হবে না (পৃ: ৮৪)

২৫. ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইবুনাল গঠন (পৃ: ৮৫)

২৬. আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও নতুন করদাতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি (পৃ: ৮৫)

২৭. ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারকারী অথচ আয়কর দেন না তাদেরকে অশ্বশক্তির ভিত্তিতে গাড়িপ্রতি নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হবে (পৃ: ৮৪)

২৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা হয়েছে (পৃ: ৮৫-৯৩)।

বাজেট প্রণয়নে অনুমানসমূহ

বাজেট প্রণয়নে যেসব অনুমানভিত্তি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো কাঙ্খিত মাত্রায় যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবসম্মত। যেমন ধরা হয়েছে, প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫%-৬%; মূল্যস্ফীতি ৬.৫%; বিশ্বমন্দার ফলে রফতানি খাতের নেতিবাচক প্রভাব; রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি হ্রাস (মোট রেমিটেন্স বৃদ্ধি, ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে); রাজস্ব সংগ্রহ

বৃদ্ধি (কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের ভিত্তি সম্প্রাসারিত হবার ফলে)। সেই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসনসহ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিকভাবেই যেসব নির্দেশক অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তা হলো– কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়ন।

বাজেটের আয়-ব্যয়-আকার

বাজেটের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৬.৫%)। যা বাজেটের আকারের সাধারণ গতিধারা ও মূল্যস্ফীতির নিরিখে গত বছরের বাজেটের তুলনায় খুব একটা বেশি নয়। এ বছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হবে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। যেখানে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে (২৯.৯%), তারপরে আছে মানব সম্পদ– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (২৩.৫%), যোগাযোগ (১৫.৭%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে (১৪%)। মূল বাজেটের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো হ'ল ৩২.৭% সামাজিক অবকাঠামো খাতে, ২৭.৭% ভৌত অবকাঠামো খাতে এবং ২২.৬% সাধারণ সেবা খাতে বরাদ্দ। **বাজেটের এ কাঠামো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ৫টি অগ্রাধিকারের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।**

মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৭৯ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা। ফলে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপি-র ৫ শতাংশ। এ ঘাটতির ৬০% মেটানো হবে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে আর ৪০% মেটানো হবে বৈদেশিক সূত্র থেকে।

এবারের বাজেটের আয়-ব্যয়-আকার বিশ্লেষণে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো:

১. গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ছিলো ৯৪,১৪০ কোটি টাকা (প্রস্তাবিত ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা)। সে হিসেবে এবারের বাজেট পূর্বের অর্থবছরের তুলনায় ২১% বেশি। এই বৃদ্ধির হার আমাদের মতে, উচ্চাভিলাষী নয়। গত সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ছিলো ২৯,৯৬০ কোটি (অনুদান ব্যতীত) টাকা যা কিনা তৎকালীন জিডিপির ৪%। এবারে ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে ৩৪,৩৫৮ কোটি টাকায় যা জিডিপির ৫%। এটি সহনীয় মাত্রাতেই রয়েছে। এবারের বাজেটকে আমরা এক কথায় বলতে পারি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের এক চেষ্টা যেখানে বিশ্ব মন্দায় টিকে থাকবার কৌশলও খোঁজা হয়েছে। **সম্প্রসারণমুখী এ বাজেট সম্পদ ও প্রয়োজন বিবেচনায় যথার্থ।**

২. এই অর্থবছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা ব্যয়ের এই পরিকল্পনায় এডিপি ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৫%-এর খানিক বেশি। সাড়ে ত্রিশ হাজার কোটি টাকার এডিপিকে আমরা স্বাগত জানাই যদিও আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আশাপ্রদ নয়। বরাবরই দেখা যায় যে, এডিপির বাস্তবায়ন হয় না, বছর শেষে তাড়াহুড়া করে কিছু ব্যয় করা হয়। তবে আমরা অর্থমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই যে তিনি এবার এই সংকটটি স্বীকার করেছেন। আমরা আশা করবো যে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা কিভাবে নিরসন করা যায় সে ব্যাপারে সরকার দ্রুত কাজ শুরু করবেন। আমরা এও আশা করবো যে গণখাতে ক্রয় বিধিমালা-কে এজন্য ঢেলে সাজাবার কাজটি দ্রুত আরম্ভ হবে। **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কাঠামোগত বিন্যাস যেন শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার।**

৩. কোথা থেকে আসবে টাকা?

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর	৫৩.৬%
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১৮.১%
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৩.৬%
বৈদেশিক ঋণ	৭.৬%
বৈদেশিক অনুদান	৪.৫%
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর	২.৬%

অর্থাৎ, সবচে' বড় উৎস হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর। অনুদানসহ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮৪ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা। যার মধ্যে রাজস্ব আয় ৭৯ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ৮.৯%। রাজস্ব আয়ের মধ্যে সবচে' বেশি অর্থ আসবে পরোক্ষ কর থেকে। যেমন মূল্য সংযোজন কর থেকে আসবে ২২ হাজার ৭৯৫ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আয়ের ৩৭.৪%। আমদানি শুল্ক থেকে আসবে ১০ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা (১৭.১%), আয়কর থেকে ১৬ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা (২৭.১%), সম্পূরক শুল্ক থেকে ১০ হাজার ৪৮৫ কোটি টাকা (১৭.২%)। **সরকারের বাজেট বাস্তবায়নে সাফল্যের মাত্রা অনেকটাই নির্ভর করবে কর আদায়ে দক্ষতার উপর।** আদায়ে দক্ষতা না প্রদর্শন করতে পারলে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তাই, অর্থবছরের একেবারে প্রথম দিক থেকেই এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের বড় উৎস ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া ঋণ। সুদ পরিশোধের ব্যয় এবারে প্রথম সর্বোচ্চ খাত (দ্বিতীয় জনপ্রশাসন অর্থাৎ বেতন-ভাতা ইত্যাদি)। ফলে সরকার এক ধরনের দায়ও নিচ্ছে বাজেটের অর্থ বরাদ্দে। **সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিকে সমর্থন দেবার জন্য মুদ্রানীতি তথা**

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি কম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এই বাজেটে; কিন্তু অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এদিকে নজর রাখার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাই। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি সংযত করবে নাকি সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতিকে সহায়তা দিতে সুদের হার কমিয়ে রেখে বৃদ্ধি করবে অর্থপ্রবাহ এই 'ট্রেড অফ' এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের কড়া নজরদারী রাখা উচিত এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। **রাজস্ব নীতিকে লাগসই করতে হবে আশু।**

৪. কোথায় ব্যয় হচ্ছে বাজেটের টাকা?

সুদ	১৩.৯%
জনপ্রশাসন	১৩.৬%
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১১.৯%
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৭.৬%
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৭.৩%
পরিবহন ও যোগাযোগ	৬.৩%
ভর্তুকি	৬.১%
স্বাস্থ্য	৫.৯%
প্রতিরক্ষা ব্যয়	৫.৩%
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪.৯%
কৃষি	৪.৫%
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	৩.৮%
পেনশন	৩.২%
গৃহায়ন	১.১%
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	০.৮%
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	০.৭%

গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষি প্রাধান্য পেয়েছে এবারকার বাজেটে। প্রাধান্য পেয়েছে বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ ও কর্মসৃজন প্রক্রিয়া। এসবই ইতিবাচক দিক এই বাজেটের।

৫. প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সামগ্রিক কাঠামো চারটি খাতে বিন্যস্ত করা হয়েছে: এক, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বঞ্চিত অংশের জন্য বিশেষ ভাতা প্রদান; দুই, দারিদ্র নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ ও বিভিন্ন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মসৃজন; তিন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাদ্যনিরাপত্তামূলক কার্যক্রম এবং চার,

দারিদ্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থদানের জন্য নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি বিষয়ে সহায়তা প্রদান। এ সকল কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা মাথাপিছু ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২২ লাখ ৫০ হাজার করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮১০ কোটি টাকা (আগে ছিলো ৬০০ কোটি টাকা)। দুস্থ মহিলা ভাতার হারও হবে ৩০০ টাকা, সেজন্য বরাদ্দ ৬১ কোটি ২০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩৩১ কোটি ২০ লাখ টাকা করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার হার ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা করবার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজারে উন্নীত করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ১১৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সরকারি এতিমখানার শিশুদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরও নানান খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করাকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে আমরা এও জানি যে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের সবচে' বড় সমস্যা দুর্নীতি এবং সঠিক বাস্তবায়ন। তাই, সরকারকে এদিকে বিশেষ নজর দেয়ার অনুরোধ জানাই। **আমরা বিশ্বাস করি, যে সরকারের দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বহুমুখী সম্প্রসারণ ও বরাদ্দ বৃদ্ধি সাজুয্যপূর্ণ, কিন্তু এক্ষেত্রে দরকার সঠিক নজরদারি এবং জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ বিতরণ ব্যবস্থা।**

৬. কৃষি খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৫ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা। গত বছরের তুলনায় এই বরাদ্দ কম হলেও কৃষি সহায়ক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছে। গঙ্গা ব্যারাজ নির্মাণ, গড়াই নদীসহ ২৩টি নদী খনন ইত্যাদির ফল কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়াবার সম্ভাবনা আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম অনেক কমে যাওয়ায় কৃষি ভর্তুকি কমানো হয়েছে। কৃষিঋণে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। **কৃষি খাতের উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে; মধ্যসত্বভোগীদের কার্যক্রম স্থিমিত করবার জন্য সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ।**

৭. প্রতিরক্ষা খাতে মোট ৮ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের চেয়ে ৪১৫ কোটি টাকা বেশি (সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১৮৬ কোটি টাকা বেশি)। গত অর্থবছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিলো মোট ব্যয়ের প্রায় ৮%। এবার সেটি হয়েছে মোট ব্যয়ের ৫.৩%। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখবার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করি। তবে

আমরা এও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে প্রতিরক্ষা খাতের নানা রকমের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করা হলে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনমনে এ নিয়ে যে নানা প্রশ্ন আছে তা প্রশমিত হবে।

৮. এবারের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা, আর সে সাথে গত বছরের অব্যয়িত আছে ৩০০ কোটি টাকা।

৯. এই বাজেটে স্থানীয় শিল্পকে নানান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেটি প্রশংসাযোগ্য। তবে এখনো প্রণোদনা প্যাকেজে রপ্তানি খাতের অংশটুকু ঠিক কতটুকু সেটি স্পষ্ট নেই। এটি পরিষ্কার করা উচিত। তবে সম্পূরক শুল্কের বৃদ্ধি এবং রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করবার ফলে উদারীকরণের বিপরীতে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা পাবে বলেই মনে হয়। তবে টেক্সটাইল এবং তৈরি পোষাক শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীবর্গ বলছেন এই বাজেটে তাদের সেভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ করা হয়নি। আমরা চাইবো সরকার তাঁদের বক্তব্যও শুনবেন এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নেবেন।

১০. জেন্ডারভিত্তিক বাজেটেও মনোযোগ দিয়েছে সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা– এ চারটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের জেন্ডারভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি একটি শুভ উদ্যোগ। আমরা আশা করবো অন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেটেও এমন বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেয়া হবে। জেন্ডার বাজেট পদ্ধতিতাত্ত্বিক দিক থেকে একটি জটিল বিষয়। তাই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয় করে কাজটি সমাধা করবার প্রস্তাব জানাই।

১১. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ধারণাটি আমাদের দেশে নতুন না হলেও এই প্রথমবারের মতো বাজেটে একে এতো গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হলো। পিপিপি বাজেটে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। পিপিপি ধারণা হিসেবে মন্দ নয়, বড় আকারের বিনিয়োগ চাইলে এটি একটি উপযুক্ত পথ হতেই পারে। এখানে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে 'প্রাইভেট' খাতের মুনাফা অর্জন যেন 'পাবলিক' খাত-এর স্বার্থকে নষ্ট করতে না পারে। এজন্য শক্ত-দেশপ্রেমিক রেগুলেটরি বডি প্রয়োজন। আমরা মনে করি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাতসমূহকে পিপিপি-র অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই সাথে পিপিপি-সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে সংবিধানে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব অন্যের কাধে চাপানোর সামিল।

১২. **জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়নের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবারকার বাজেট বক্তৃতায়। এর ফলে সরকারি ব্যয়ের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবার একটি পথ যেমন তৈরি হলো, তেমনি, এটি আঞ্চলিক বৈষম্য ও সমস্যা দূরীকরণেও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।** আমরা এই শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে পাশাপাশি এও মনে করি এর জন্য দরকার নির্মোহ দেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞদের যারা সরকারের এরূপ বাজেট তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

১৩. জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত বেতন প্রদানের পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার শুরু হতে যাচ্ছে ১ জুলাই থেকে। সরকারি কাজে প্রণোদনা হিসেবে এটি শুভ উদ্যোগ। **বেতন বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত অপব্যবহার করে ব্যবসায়ী মহল যেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি না করতে পারে সে ব্যাপারে নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।**

১৪. সামগ্রিক ঘাটতি ৩৫ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা। অনুদান ব্যতিরেকে ঘাটতি ২৯ হাজার ২২৮ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মেটাতে ৮ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ নেয়া হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া হবে ১৬ হাজার ২৭৭ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে পাওয়া যাবে ৩ হাজার ২৭৭ কোটি টাকা।

বাজেট ঘাটতি সম্পর্কিত আমাদের মত নিম্নরূপ:

ক. **ঘাটতি মেটাতে বৈদেশিক উৎসের বিষয়ে দেশজ স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। দেশের জন্য প্রতিকূল শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান বর্জন করতে হবে।**

খ. **ঘাটতি মেটাতে অভ্যন্তরীণ উৎসে হাত দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা উৎপাদনশীল বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।**

গ. **ঘাটতি যেন জিডিপি-র ৫%-এর বেশি না হয়।**

১৫. আগামী অর্থবছর থেকে তিন বছরের জন্য অপ্রদর্শিত আয় তথা কালো টাকাকে ১০% কর দিয়ে বিনা প্রশ্নে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট ৪২টি খাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। **বাজেটে এই অনৈতিক সুযোগ দেয়া আমরা বিরোধিতা করি– অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দিক থেকে।** এর ফলে নিয়মিত এবং সৎ করদাতারা নিরুৎসাহিত হবেন। কালো টাকার মালিকরা আরো বেশি করে কালো টাকা বানাতে উৎসাহিত হবে। কালো টাকা ওয়ালারা অন্যদের তুলনায় অধিকতর প্রতিযোগিক্ষম হয়ে

উঠবে। আমরা এই প্রক্রিয়ার অবসান আশা করছিলাম। তারপরও যদি সরকার কোনো আপোষকামী কারণে মনে করেন যে কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ দেয়া হবেই তবে এটি যেন অবশ্যই নিশ্চিত করা হয় যেন এই টাকা অবশ্যই উৎপাদনশীল শিল্প খাতে বিনিয়োগ করা হয় (জমি-বাড়ী-ফ্ল্যাট ক্রয়ের মতো ক্ষেত্রে কোনোমতেই নয়)। আমরা আরও আশা করবো এই অনৈতিক প্রক্রিয়া যেন ভবিষ্যতে কোনোমতেই চালু না থাকে।

১৬. **এবারের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যথামাত্রায় গুরুত্ব পায়নি।** যেমন ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টন, খাস জমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাস জলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গা চাষীর বর্গা স্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ক্ষুদ্র-কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় বাজেটে উল্লেখ নেই। **আমরা মনে করি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রদেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাজেটে গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল।**

১৭. **বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবেলায় (অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে) অর্থনৈতিক-কূটনীতি শক্তিশালী করতে হবে।**

আমাদের শেষ কথা

আমরা জানি ও বুঝি যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী সিস্টেমের আওতায় পুঁজিবাদী এক বাজার অর্থনীতির মধ্যে আমাদের বসবাস। আর তারই মধ্যে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে, মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ করবো। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ, আর এ কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দেবেন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকেরা। দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দিন বদলের সংস্কৃতি। এ রূপান্তর এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে "বদলের নির্দেশকারী দলিল"। এ নিরিখে এ বছরের বাজেট বেশ কিছু æpolitical compromise" (রাজনৈতিক আপোষ)-এর মধ্যেও আশা সঞ্চারণকারী দলিল। এবারের বাজেট অনেক দূর পর্যন্ত "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত" দলিল। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে। 'রূপকল্প ২০২১' যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা

সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের। আমরা বিশ্বাস করি আলোকিত এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কোনো অবকাশ নেই। বিলম্ব অপূরণীয় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এ বিশ্বাস অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানবিক যে কোনো মানদণ্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের প্রাক-বাজেট সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. আবুল বারকাত *
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী **

ভূমিকা

গত ২৭ এপ্রিল ২০১০ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে আমরা নবম জাতীয় সংসদের অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাছে জাতীয় বাজেট ২০১০-১১-র জন্য কিছু সুপারিশ পেশ করি। আজ আমরা সংসদের উল্লেখিত স্থায়ী কমিটির কাছে পেশকৃত সুপারিশসমূহের পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

১. বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী এবং নির্বাচনী ইশতেহারের "রূপকল্প ২০২১"-এর আলোকে এখন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (6^{th} Five Year Plan) প্রণয়ন কাজ প্রায় শেষের দিকে। এবারের বাজেটের তত্ত্ব ভিত্তি হিসেবে উল্লিখিত পরিকল্পনা দলিল দু'টিকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বাজেট দলিল হবে যোগসূত্রহীন।

২. ADP-র আকার বাড়ছে। এ বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্যকর বাস্তবায়ন হার বাড়ানোর পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে। গতবছর বাস্তবায়নই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি *আয়োজিত* প্রেস কনফারেন্স, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, ঢাকা: ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/ ১৯ মে ২০১০

৩. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "অধিকাংশ সরকারি ব্যয়ই সরকারের জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতির সাথে যথাযথ সম্পর্কযুক্ত থাকে না। থাকে না এ সম্পদ ব্যবহার করে কাঙ্খিত কী ফলাফল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনাও" (পৃ: ১৯)– এ বিষয়ে এ বছরে নতুন কি বলা হচ্ছে?

৪. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় থাকে সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈত্বতা (পৃ: ২১)– এবার পরিবর্তন কি হচ্ছে?

৫. গত বাজেটে বলা হয়েছিলো "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজেট বাস্তবায়ন যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয় না" (পৃ:১৯)– এ বিষয়ে এবারের বক্তব্য কি হবে?

৬. শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

৭. "আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও নতুন করদাতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি (পৃ: ৮৫)" – এ বিষয়ে অগ্রগতি বলা দরকার। ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্দেশ করা প্রয়োজন।

৮. "দারিদ্র দূর ও বৈষম্য রুখো" নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের মধ্যে **আঞ্চলিক বৈষম্য** দূর করার কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে।

৯. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত জাতীয় বাজেটে জেলা অথবা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। আমরা বলতে পারি না কী পরিমাণ সরকারি অর্থ একটি নির্দিষ্ট জেলায় ব্যয় হচ্ছে" (পৃ: ২২)– এবারে কি আমরা জেলাওয়ারি বলতে পারছি?

১০. বাজেটে প্রাধান্য দিতে হবে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও কর্মসৃজন প্রক্রিয়া।

১১. সরকারের দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বহুমুখী সম্প্রসারণ ও বরাদ্দ বৃদ্ধি সাজুয্যপূর্ণ, কিন্তু এক্ষেত্রে দরকার সঠিক নজরদারি এবং জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ বিতরণ ব্যবস্থা।

১২. বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমুখী। তবে কাঠামোগত বিন্যাস যেন জনকল্যাণকামী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল শক্তিশালী করার দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

১৩. সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিকে সমর্থন দেবার জন্য মুদ্রানীতি তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি কম রাখার চেষ্টা করতে হবে, তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এদিকে নজর রাখার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাই। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি সংযত করবে নাকি সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতিকে সহায়তা দিতে সুদের হার কমিয়ে রেখে বৃদ্ধি করবে অর্থপ্রবাহ এই 'ট্রেড অফ' এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের কড়া নজরদারী রাখা উচিত এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। রাজস্ব নীতিকে লাগসই করতে হবে আশু।

১৪. নন-ইনফ্লেশনারী ঘাটতি অর্থায়ন মোকাবেলায় সরকারি বন্ড মার্কেট বিকশিত করা প্রয়োজন। কর আয় বাড়ানোর জন্য: এনবিআর-এর মানব সম্পদ বাড়ানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি, কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সততা, কর পরিধি বৃদ্ধি, অন-লাইন কর প্রদান, ধনী কৃষকদের করারোপ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৫. গতবার বলা হয়েছিলো "খাত/মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী নারী উন্নয়ন-নিমিত্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা জরুরি" (পৃ: ২১)– এবারে হচ্ছে কি? সেইসাথে জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান বিনির্মানে বরাদ্দ দেয়া জরুরী।

১৬. সম্পূরক শুল্কের বৃদ্ধি এবং রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করে উদারীকরণের বিপরীতে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা করা প্রয়োজন।

১৭. "শুল্ক ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে...। আমরা স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ ও বাণিজ্য উদারীকরণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে চলতে চাই। ....রাজস্ব ঘাটতি পূরণে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।.... আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আহরণ বাড়াতে হবে" (পৃ: ৮০)। এসব ছিলো গত বারের কথা। এবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কি বলছি?

১৮. কর ব্যবস্থা যেন অব্যাহতি বহুল (exemption-ridden) না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ বলা জরুরি।

১৯. গত বাজেটে বলা হয়েছিলো "২০১২ সালের পরে বিদ্যমান কর অবকাশ ব্যবস্থা প্রলম্বিত হবে না (পৃ: ৮৪)"– এবার আমরা একই বক্তব্য দিতে পারি।

২০. "ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইবুনাল গঠন (পৃ: ৮৫)"– এ বিষয়ে অগ্রগতি বলা দরকার।

২১. কালো টাকা সাদাকরণ প্রস্তাবনা– বাজেটে থাকা উচিত নয়– অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দিক থেকে।

২২. দেশে এখন সঞ্চয় হার বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি। এ ভারসাম্যহীনতার কারণে সঞ্চয়ের বেশ বড় অংশ speculative market -এ যাবার প্রবণতা বেড়েছে। সুতরাং সঞ্চয়কে অধিকহারে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নেবার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ থাকতে হবে।

২৩. আমাদের দেশে cost of doing businees কমানোর পদক্ষেপ বাজেটে উল্লেখ থাকতে হবে।

২৪. ইদানিং পুঁজি বাজার বেশ স্ফীত হচ্ছে। BO-একাউন্ট যাদের থাকবে তাদের TIN থাকতে হবে। Capital gain tax থাকতে হবে।

২৫. গত বাজেটে "আর্থিক খাত সংস্কার ও পুঁজিবাজার সংস্কার" (পৃ: ৬৯-৭১)– এর কথা বলা হয়েছিলো। এ বছরের বাজেটে সংস্কার অবস্থা বলা উচিত, সেই সাথে বলা উচিত সামনে আমরা কি করতে যাচ্ছি।

২৬. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ধারণাটিকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বড় আকারের বিনিয়োগ চাইলে পিপিপি একটি উপযুক্ত পথ। এখানে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে 'প্রাইভেট' খাতের মুনাফা অর্জন যেন 'পাবলিক' খাত-এর স্বার্থকে নষ্ট করতে না পারে। এজন্য শক্ত-দেশপ্রেমিক রেগুলেটরি বডি প্রয়োজন। আমরা মনে করি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাতসমূহকে পিপিপি-র অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই সাথে পিপি-পি-সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে সংবিধানে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব অন্যের কাধে চাপানোর সামিল।

২৭. PPP-র নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। দেশজ ব্যাংকগুলোকে বেশি করে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

২৮. তিন খাত ভিত্তিক PPP : কারিগরি সহায়তা খাত, বীজ–অর্থায়ন (viability gap funding), অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল (পৃ: ১৮-১৯)– গত বাজেটে বলা হয়েছিলো। গত এক বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামনের বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকা দরকার।

২৯. প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে PPA, PPR সংশোধন বিবেচনা এবং পরিবীক্ষণ শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন।

৩০. গত বাজেটে বলা হয়েছিলো "আমাদের উন্নয়ন প্রয়াস বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির দ্বারা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত" (পৃ: ৩৫)। "পল্লী বিদ্যুতের

উন্নয়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করে" (পৃ: ৩৭)। "পল্লী বিদ্যুতায়ন সামষ্টিক রূপকল্প অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার" (পৃ: ৩৪)– এসব বিষয়ে এবছরের বাজেটে সময়-নির্দিষ্ট স্পষ্ট রূপরেখা থাকা জরুরি। আমাদের মতে এ রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত যা অবশ্যই থাকা উচিত তা হল : সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ; গ্রীড এবং অফ-গ্রীড মিক্স নির্ধারণ; জাতীয় কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ এবং কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন; বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যারা নিজেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন তাদের জন্য আমদানী স্তরে শুল্ক রেয়াত; সৌর বিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান; দেশজ গ্যাস ও কয়লা আহরণ/উত্তোলন-এ 'বাংলাদেশ এনার্জি ফান্ড' বৃদ্ধি করা এবং ঐ ফান্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা; এনার্জি ফান্ড গঠনে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ব্যবহার এবং সেই সাথে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা; বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করা; পুরানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মেরামত, সংস্কার ও চলমানতা বজায় রাখা; পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা; পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকাণ্ড ঢেলে সাজানো; সিস্টেম লস হ্রাসে উদ্যোগ নেয়া; মুল্য যৌক্তিকিকরণ এবং সেগমেনটেড মুল্য নির্দ্ধারণ।

৩১. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠন (পৃ: ৩৯)– অবস্থা জানানো দরকার।

৩২. পদ্মা সেতু ও (কর্ণফুলীতে) ঝুলন্ত সেতুর বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার; টঙ্গি ভৈরববাজার পর্যন্ত রেলওয়ের ডাবল লাইন নির্মাণ; নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন; ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, তেজগাঁও থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত টানেল, ঢাকার চারপাশে সার্কুলার রেল স্থাপন, ঢাকা ইস্টার্ন বাইপাস– এসবের সম্ভাব্যতা যাচাই (পৃ: ৪২-৪৫)–গত বাজেটে এসব বলা হয়েছিলো। এসব বিষয়ে অগ্রগতি-অবস্থা বলা দরকার।

৩৩. "গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ" (পৃ: ৪৩)– বলা হয়েছিলো গত বাজেটে। এ বছর এ খাতের জন্য ভাবনাটা কি?

৩৪. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সুবিধাদি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে" (পৃ: ৪৫)। এ বিষয়ে এ বছরের বাজেট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৩৫. নদীর নাব্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে নৌপথে মালামাল ও যাত্রি পরিবহন উভয়ই যথেষ্ট সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ।

৩৬. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো"সচেতন সরকারি হস্তক্ষেপহীন মুক্তবাজার অর্থনীতি টেকসই নয়" (পৃ: ৪১)। এ বিষয়ে এ বছরের বাজেটে স্পষ্ট নির্দেশন থাকা জরুরি।

৩৭. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে টিসিবি শক্তিশালীকরণ" (পৃ: ৭২)– এর কথা। কাজটি হয়নি। আমরা মনে করি টিসিবি শক্তিশালী করা জরুরি। সেই সাথে দরিদ্র-প্রান্তিক ক্ষুদে কৃষকদের থেকে সরকারিভাবে শস্য-ফসল ক্রয় বাড়ানো জরুরি-এবং তা হতে হবে ফসল ওঠার সাথে সাথে (সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে যেন কৃষক কোনোভাবেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন না হন)। এ লক্ষ্যে শস্য-ফসল-ফলমূল সংরক্ষণের জন্য সরকারি গুদামের সংখ্যা এবং ধারণক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

৩৮. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "জনপ্রশাসন সংস্কার অপরিহার্য" (পৃ: ৭৩)। এ বিষয়ে অগ্রগতির কথা বলা প্রয়োজন; সেই সাথে আগামী একবছরে কি হবে তাও বলা দরকার।

৩৯. "অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হ'ল দুর্নীতি। দুর্নীতি দূর না হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে না" (পৃ: ৭৭)। গত বাজেটে এসব বলা হয়েছিলো। এবার সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ-এর কথা থাকতে পারে কিনা?

৪০. "দুর্নীতি, অনিয়ম ও অদক্ষতা দূর করতে সরকারি ক্রয়, প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ, টেন্ডার এবং সমাপ্ত প্রকল্পের মান যাচাইয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা" (পৃ: ৭৭)। এবারের বাজেটে এ বিষয়ে জোর দেয়া দরকার।

৪১. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে "দেশে উন্নয়নমুখী একটি সংহত শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার অন্যতম হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোই থাকবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে। ....আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে চাই" (পৃ: ৭৮-৭৯)। এবার আমরা কি বলবো– ভাবা দরকার।

৪২. এবারের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যথামাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টন, খাস জমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাস জলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গা চাষীর বর্গা স্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ক্ষুদ্র-কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

ইত্যাদি বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট থাকতে হবে। আমরা মনে করি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রদেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাজেটে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪৩. দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন-ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য-বহুমুখীকরণ-এর দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য শস্য-বীমা চালু করার কথা ভাবতে হবে।

৪৪. কৃষির গবেষণা-উন্নয়ন (R & D) ব্যয়-বরাদ্দ যথেষ্ট মাত্রায় বাড়াতে হবে।

৪৫. কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিশেষতঃ তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে বাজেটে আর্থিক নির্দেশনা থাকা জরুরি।

৪৬. কৃষি খাতের উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে; মধ্যসত্বভোগীদের কার্যক্রম স্থিমিত করবার জন্য সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ।

৪৭. এবারের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

৪৮. "শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য" (পৃ: ৪৯)– গত বছরের বাজেটে এ কথা বলার পরে এ বছরের বাজেটে কার্যকর কি কি থাকছে?

৪৯. পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্র উপবৃত্তি চালু করা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি (পৃ: ৪৮)– গত বাজেটে এসব বলা হয়েছিলো। আগামী বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রস্তাবনা থাকা উচিত।

৫০. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২,০০০-৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘুর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার মোট ছাত্রসংখ্যার ৪০% থেকে বাড়িয়ে ১০০%-এ উন্নীত করা। অতি দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি – এসব এ বছরের বাজেটে থাকতে হবে।

৫১. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন (পৃ: ৫১)– গত বছরের এ প্রস্তাবনার অগ্রগতি কি হয়েছে এবং আগামী বছরে কি হবে তা বলা জরুরি।

৫২. "কৃতি গবেষকরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রণোদনা-প্রস্তুতি (পৃ: ৫২)"– এ ছিল গত বাজেটের কথা। এ বছরও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে থাকা জরুরি।

৫৩. গত বাজেটে বলা হয়েছিলো "তরুণ প্রজন্মকে পঠনমনস্ক করার লক্ষ্যে সর্বত্র গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে (পৃ: ৬৫)" – অগ্রগতি বলা উচিত; সেই সাথে এ বছরের বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা উচিত।

৫৪. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সুষম উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন" (পৃ: ৬৬)। এ লক্ষ্যে এ বারের বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি।

৫৫. গত বাজেটে বলা হয়েছিল প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলা গ্রোথ সেন্টার কেন্দ্রিক পল্লী নিবাস ও শহরাঞ্চলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসন গড়ে তোলা হবে (পৃ: ৪৭)– এ বছর বিষয়টি থাকতে হবে এবং দিক-নিদের্শনা সুস্পষ্ট হতে হবে।

৫৬. "সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য নীতি নবায়ন ও জাতীয় ওষুধ নীতি (২০০৫) যুগোপযোগিকরণ (পৃ: ৫৩-৫৪)"– বিষয়টির অগ্রগতি বলা জরুরি।

৫৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি জরুরি।

৫৮. গত বাজেটে বলা হয়েছিলো "বেকার যুবকদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন করা হবে" (পৃ: ৫৭)– অগ্রগতি বলা প্রয়োজন। সেই সাথে এ বছরের বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ পথ-পদ্ধতি বলা দরকার।

৫৯. গত বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছিলো "কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রকট দারিদ্রপীড়িত এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসৃজনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব" (পৃ: ৫৯)– এ বছর সুনির্দিষ্ট কার্যকর প্রস্তাবনা থাকতে হবে।

৬০. ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী বিশেষত: নারীদের জন্য কর্মসৃষ্টির প্রয়াস জোরদারকরণে বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেন মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫% পান এবং সুদের হার ৮-১০% এর মধ্যে রাখা সম্ভব।

৬২. বিদেশে নারী শ্রমিক প্রেরণ এবং পোষাক শিল্পে কর্মরত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বরাদ্দ বাড়ানো জরুরী।

৬৩. "পথশিশুদের নিরাপত্তা আবাসন হিসেবে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন (পৃ: ৬১)") জরুরি ভিত্তিতে দেখা প্রয়োজন।

৬৪. অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংস্থান এবং শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য সেল্টার হোম নির্মাণ (পৃ: ৪৭)– বিষয়টি এবছরের বাজেটেও থাকতে হবে।

৬৫. "সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার আওতায় আনা" (পৃ: ৬৩)। "দেশের হাজার হাজার অচিহ্নিত গণকবর চিহ্নিত করা" (পৃ: ৬৪)। এসব বক্তব্য বাজেটে ছিল। এ বছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি।

৬৬. আর্সেনিক মুক্ত পানির উৎস নির্মাণ প্রসঙ্গে বাজেট ভাবনা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

৬৭. "একটি বাড়ী একটি খামার" (পৃ: ৩২)– কার্যকর করা জরুরি।

৬৮. গো-সম্পদ উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার।

৬৯. রপ্তানীর জন্য নতুন গন্তব্য দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

৭০. রপ্তানী-বাস্কেট বহুমুখীকরণ এবং সেই সাথে যারা উচ্চ-মূল্যের রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করবেন তাদের প্রণোদনা দিতে হবে।

৭১. সমুদ্র ও স্থল বন্দরের কন্টেইনার সিস্টেম আধুনিকায়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমুদ্র-স্থল-আকাশ বন্দরে স্টোরেজ-ফ্যাসিলিটি উন্নয়ন প্রয়োজন।

৭২. যারা বিদেশে শ্রম শক্তি প্রদানে যাবেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৭৩. প্রবাসে কর্মরতদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের শেষ কথা

আমরা জানি ও বুঝি যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী সিস্টেমের আওতায় পুঁজিবাদী এক বাজার অর্থনীতির মধ্যে আমাদের বসবাস। আর তারই মধ্যে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে, মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ করবো। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ, আর এ কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব

দেবেন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকেরা। দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দিন বদলের সংস্কৃতি। এ রূপান্তর এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে "বদলের নির্দেশকারী দলিল"। আগামী বাজেট হতে হবে "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত" দলিল। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে। 'রূপকল্প ২০২১' যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের। আমরা বিশ্বাস করি আলোকিত এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে বিলম্বের কোনো অবকাশ নেই। বিলম্ব অপূরণীয় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এ বিশ্বাস অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানবিক যে কোনো মানদে ই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট : প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. আবুল বারকাত *
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী **

ভূমিকা

াত ১০ জুন ২০১০/২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট পেশ করলেন। ৫-টি অধ্যায়ে বিভাজিত ২৮৬ পয়েন্ট সম্বলিত ১১১ পৃষ্টার বাজেট বক্তৃতার শুরু ও শেষ হয়েছে মহাজোটের দিনবদলের সনদ "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের আকাঙ্খা নিয়ে। যে আকাঙ্খার পক্ষে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারকে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ গণতান্ত্রিক রায় দিয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১'-এর মূল কথা হল–মুক্তিযুদ্ধের সুর্বন জয়ন্তী নাগাদ অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র। "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জনকল্যানকামী অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বির্নিমানে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-তথ্য-প্রযুক্তিসহ দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসে ২২টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। সে সাথে ইশতেহারে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার উল্লেখ করা হয়েছিলো: (১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবেলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, (২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, (৪) দারিদ্র ঘুচাও বৈষম্য রুখো, এবং (৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রেস কনফারেন্স, স্থান: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/ ১৩ জুন ২০১০

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি- এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবি সংগঠন। আমাদের সমিতি মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা অর্থাৎ বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো বিনির্মানে বিশ্বাস করে। আর একই কারণে উল্লেখিত "রূপকল্প ২০২১"-এর চেতনা ধারণ করে। সে কারণেই আমাদের সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের প্রেস কনফারেন্সে এবারের বাজেট-উত্তর প্রতিক্রিয়া সে নিরিখেই বস্তুনিষ্ঠতার সাথে উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নবম জাতীয় সংসদের অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি জাতীয় বাজেট ২০১০-১১ কেমন হওয়া উচিত–এ বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতামত-সুপারিশ জানবার জন্য গত ২৭ এপ্রিল ২০১০ স্থায়ী কমিটিতে আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলো। আমরা ঐ দিন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে ৬৪টি লিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করেছিলাম। এবং প্রথম সুপারিশেই বলেছিলাম "বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী এবং নির্বাচনী ইশতেহারের রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে এখন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ প্রায় শেষের দিকে। এবারের বাজেটের তত্ত্ব ভিত্তি হিসেবে উল্লেখিত পরিকল্পনা দলিল দু'টিকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বাজেট দলিল হবে যোগসূত্রহীন"। অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপিত আমাদের ৬৪-টি সুপারিশ-এর মোদ্দা কথা ছিল দ্বি-বিধঃ (১) গত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাল-অবস্থা এ বছরের বাজেটে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, এবং (২) গত বছর ছিল না অথচ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে জরুরী এমন কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা।

অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রাক-বাজেট ৬৪-টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করার পরে আমাদের সমিতির পক্ষে আমরা গত ১৯ মে ২০১০ প্রাক-বাজেট প্রেস কনফারেন্স করি। ঐ প্রেস কনফারেন্সে আপনাদের উপস্থিতিতে আমরা ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য মোট ৭৩-টি সুপারিশ উপস্থাপন করি। সেখানে আমরা উপসংহারে বলেছিলাম "দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দিন বদলের সংস্কৃতি। এ রূপান্তর এক বাজেটের বিষয় নয়-কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে "বদলের নিদের্শকারী" দলিল। আগামী বাজেট হতে হবে "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ণ দর্শন উদ্ভুত দলিল। ...রূপকল্প ২০১০ যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা, যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠির স্বার্থানুকূলে হতেই হবে।..উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বন্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের"।

ভূমিকাতেই কিছু সত্য স্বীকার করা জরুরী যে (১) অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্টরা এবার বাজেট প্রণয়নের আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বক্তব্য-মতামত-সুপারিশ বেশি মনোযোগের সাথে শুনেছেন, (২) এবারের বাজেটে আমাদের অনেক সুপারিশ গ্রহনও করা হয়েছে-এ জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বাজেট প্রণয়ণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা কি সুপারিশ করেছিলাম

সাংবিধানিক অঙ্গিকার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক জনকল্যাণকামী বাজেট প্রণয়ন ত্বরান্বিত করতে আমরা অনেকগুলো সুপারিশ করেছিলাম– যা বৃহৎ পরিসরের উন্নয়ন দর্শন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পরিসরের খাত ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. বাজেটের তত্ত্বভিত্তি হিসেবে প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত সরকারের প্রনয়াণাধীন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (6th Five Year Plan) - দলিল দু'টিকে গ্রহণ করতে হবে।

২. ADP-র আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্যকর বাস্তবায়ন হার বাড়ানোর পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে।

৩. সরকারি ব্যয় সরকারের জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতির সাথে যথাযথ সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে ও এ থেকে কাঙ্খিত কী ফলাফল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনাও দিতে হবে।

৪. বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈত্বতা পরিহার করতে হবে।

৫. বাজেট বাস্তবায়ন যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা উচিত।

৬. শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

৭. আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও নতুন করদাতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির বিষয়ে অগ্রগতি বলা প্রয়োজন।

৮. "দারিদ্র দূর ও বৈষম্য রুখো" নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার কার্যকর উদ্যোগ থাকতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত জাতীয় বাজেটে জেলা অথবা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন থাকতে হবে। কী পরিমাণ সরকারি অর্থ একটি নির্দিষ্ট জেলায় ব্যয় হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

১০. বাজেটে প্রাধান্য দিতে হবে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও কর্মসৃজন প্রক্রিয়া।

১১. সরকারের দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বহুমুখী সম্প্রসারণ ও বরাদ্দ বাড়াতে হবে, এবং এক্ষেত্রে দরকার সঠিক নজরদারি এবং জবাবদিহিতামূলক স্বচ্ছ বিতরণ ব্যবস্থা।

১২. বাজেট হতে হবে সম্প্রসারণমুখী। তবে কাঠামোগত বিন্যাস যেন জনকল্যাণকামী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল শক্তিশালী করার দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

১৩. সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতিকে সমর্থন দেবার জন্য মুদ্রানীতি তথা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি কম রাখার চেষ্টা করতে হবে, তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব মূল্যস্ফীতিতে পড়ারও সম্ভাবনা থাকে। এদিকে নজর রাখার প্রয়োজন। মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি সংযত করবে নাকি সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতিকে সহায়তা দিতে সুদের হার কমিয়ে রেখে বৃদ্ধি করবে অর্থপ্রবাহ এই 'ট্রেড অফ' এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের কড়া নজরদারী রাখা উচিত এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। রাজস্ব নীতিকে লাগসই করতে হবে আশু।

১৪. নন-ইনফ্লেশনারী ঘাটতি অর্থায়ন মোকাবেলায় সরকারি বন্ড মার্কেট বিকশিত করা প্রয়োজন। কর আয় বাড়ানোর জন্য: এনবিআর-এর মানব সম্পদ বাড়ানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি, কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সততা, কর পরিধি বৃদ্ধি, অন-লাইন কর প্রদান, ধনী কৃষকদের করারোপ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৫. খাত/মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী নারী উন্নয়ন-নিমিত্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা জরুরী। সেইসাথে জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান বিনির্মানে বরাদ্দ দেয়া জরুরী।

১৬. সম্পূরক শুল্কের বৃদ্ধি এবং রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করে উদারীকরণের বিপরীতে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা করা প্রয়োজন।

১৭. স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ ও বাণিজ্য উদারীকরণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজস্ব ঘাটতি পূরণে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর আহরণ বাড়াতে হবে।

১৮. কর ব্যবস্থা যেন অব্যাহতি বহুল (exemption-ridden) না হয় সে লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ বলা জরুরি।

১৯. ২০১২ সালের পরে বিদ্যমান কর অবকাশ ব্যবস্থা প্রলম্বিত করা যাবে না।

২০. ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইবুনাল গঠন – এ বিষয়ে অগ্রগতি বলা দরকার।

২১. কালো টাকা সাদাকরণ প্রস্তাবনা– বাজেটে থাকা উচিত নয়– অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দিক থেকে।

২২. দেশে এখন সঞ্চয় হার বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি। এ ভারসাম্যহীনতার কারণে সঞ্চয়ের বেশ বড় অংশ speculative market -এ যাবার প্রবণতা বেড়েছে। সুতরাং সঞ্চয়কে অধিকহারে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নেবার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ থাকতে হবে।

২৩. আমাদের দেশে cost of doing businees কমানোর পদক্ষেপ বাজেটে উল্লেখ থাকতে হবে।

২৪. ইদানিং পুঁজি বাজার বেশ স্ফীত হচ্ছে। BO-একাউন্ট যাদের থাকবে তাদের TIN থাকতে হবে। Capital gain tax থাকতে হবে।

২৫. আর্থিক খাত সংস্কার ও পুঁজিবাজার সংস্কার সমন্ধে আমরা কি করতে যাচ্ছি তা বাজেটে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

২৬. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ধারণাটিকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বড় আকারের বিনিয়োগ চাইলে পিপিপি একটি উপযুক্ত পথ। এখানে শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে 'প্রাইভেট' খাতের মুনাফা অর্জন যেন 'পাবলিক' খাত-এর স্বার্থকে নষ্ট করতে না পারে। এজন্য শক্ত-দেশপ্রেমিক রেগুলেটরি বডি প্রয়োজন। আমরা মনে করি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা খাতসমূহকে পিপিপি-র অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। সেই সাথে পিপিপি-সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে সংবিধানে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব অন্যের কাধে চাপানোর সামিল।

২৭. PPP-র নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। দেশজ ব্যাংকগুলোকে বেশি করে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

২৮. তিন খাত ভিত্তিক PPP : কারিগরি সহায়তা খাত, বীজ–অর্থায়ন (viability gap funding), অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল সমন্ধে গত এক বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামনের বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকা দরকার।

২৯. প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে PPA, PPR সংশোধন বিবেচনা এবং পরিবীক্ষণ শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন।

৩০. আমাদের উন্নয়ন প্রয়াস বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির দ্বারা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত। পল্লী বিদ্যুতের উন্নয়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করে। পল্লী বিদ্যুতায়ন সামষ্টিক রূপকল্প অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার–এসব বিষয়ে এবছরের বাজেটে সময়-নির্দিষ্ট স্পষ্ট রূপরেখা থাকা জরুরি। আমাদের মতে এ রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত যা অবশ্যই থাকা উচিত তা হল : সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ; গ্রীড এবং অফ-গ্রীড মিক্স নির্ধারণ; জাতীয় কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ এবং কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন; বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যারা নিজেরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন তাদের জন্য আমদানী স্তরে শুল্ক রেয়াত; সৌর বিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান; দেশজ গ্যাস ও কয়লা আহরণ/উত্তোলন-এ 'বাংলাদেশ এনার্জি ফান্ড' বৃদ্ধি করা এবং ঐ ফান্ডের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা; এনার্জি ফান্ড গঠনে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ব্যবহার এবং সেই সাথে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা; বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করা; পুরানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মেরামত, সংস্কার ও চলমানতা বজায় রাখা; পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা; পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকাণ্ড ঢেলে সাজানো; সিস্টেম লস হ্রাসে উদ্যোগ নেয়া; মূল্য যৌক্তিকিকরণ এবং সেগমেনটেড মূল্য নির্দ্ধারণ।

৩১. তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-উন্নয়ন তহবিল গঠনের অবস্থা জানানো দরকার।

৩২. পদ্মা সেতু ও (কর্ণফুলীতে) ঝুলন্ত সেতুর বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার; টঙ্গি ভৈরববাজার পর্যন্ত রেলওয়ের ডাবল লাইন নির্মাণ; নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন; ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, তেজগাঁও থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত টানেল, ঢাকার চারপাশে সার্কুলার রেল স্থাপন, ঢাকা ইস্টার্ন বাইপাস–এসব বিষয়ে অগ্রগতি-অবস্থা বলা দরকার।

৩৩. গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ। এ বছর এ খাতের জন্য ভাবনাটা কি?

৩৪. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সুবিধাদি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত মানুষের কাছে পৌছাতে হবে। এ বিষয়ে এ বছরের বাজেট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৩৫. নদীর নাব্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে নৌপথে মালামাল ও যাত্রি পরিবহন উভয়ই যথেষ্ট সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ।

৩৬. সচেতন সরকারি হস্তক্ষেপহীন মুক্তবাজার অর্থনীতি টেকসই নয়–এ বিষয়ে এ বছরের বাজেটে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা জরুরি।

৩৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে টিসিবি শক্তিশালী করা জরুরি। সেই সাথে দরিদ্র-প্রান্তিক ক্ষুদে কৃষকদের থেকে সরকারিভাবে শস্য-ফসল ক্রয় বাড়ানো জরুরি-এবং তা হতে হবে ফসল ওঠার সাথে সাথে (সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে যেন কৃষক কোনোভাবেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন না হন)। এ লক্ষ্যে শস্য-ফসল-ফলমূল সংরক্ষণের জন্য সরকারি গুদামের সংখ্যা এবং ধারণক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

৩৮. জনপ্রশাসন সংস্কার অপরিহার্য বিষয়ে অগ্রগতির কথা বলা প্রয়োজন; সেই সাথে আগামী একবছরে কি হবে তাও বলা দরকার।

৩৯. অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হ'ল দুর্নীতি। দুর্নীতি দূর না হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে না। এবার দুর্নীতি দূর করার নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ-এর কথা থাকতে পারে।

৪০. দুর্নীতি, অনিয়ম ও অদক্ষতা দূর করতে সরকারি ক্রয়, প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ, টে ার এবং সমাপ্ত প্রকল্পের মান যাচাইয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করার বিষয়ে জোর দেয়া দরকার।

৪১. দেশে উন্নয়নমুখী একটি সংহত শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি দিক হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোই থাকবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বছরের বাজেটে কি থাকবে?

৪২. এবারের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যথামাত্রায় গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমির বণ্টন, খাস জমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাস জলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গা চাষীর বর্গা

স্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ক্ষুদ্র-কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে বাজেটে স্পষ্ট থাকতে হবে। আমরা মনে করি কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টিকে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রদেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাজেটে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪৩. দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন-ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শস্য-বহুমুখীকরণ-এর দিক নির্দেশনা থাকতে হবে। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য শস্য-বীমা চালু করার কথা ভাবতে হবে।

৪৪. কৃষির গবেষণা-উন্নয়ন (R & D) ব্যয়-বরাদ্দ যথেষ্ট মাত্রায় বাড়াতে হবে।

৪৫. কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিশেষত: তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে বাজেটে আর্থিক নির্দেশনা থাকা জরুরি।

৪৬. কৃষি খাতের উদ্যোগ কার্যকরী করবার জন্য বিপণন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে; মধ্যসত্বভোগীদের কার্যক্রম স্থিমিত করবার জন্য সরকারকে হতে হবে কঠোর এবং নির্মোহ।

৪৭. এবারের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

৪৮. শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এ বছরের বাজেটে কার্যকর পথ নির্দেশ থাকতে হবে।

৪৯. পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্র উপবৃত্তি চালু করা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধির নিমিত্তে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রস্তাবনা থাকা উচিত।

৫০. বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ২,০০০-৩,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদী ভাঙ্গন ও ঘুর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার মোট ছাত্রসংখ্যার ৪০% থেকে বাড়িয়ে ১০০%-এ উন্নীত করা এবং অতি দরিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির পদক্ষেপ এ বছরের বাজেটে থাকতে হবে।

৫১. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন–গত বছরের এ প্রস্তাবনার অগ্রগতি কি হয়েছে এবং আগামী বছরে কি হবে তা বলা জরুরি।

৫২. কৃতি গবেষকরা যাতে স্বদেশেই তাদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা চালিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রণোদনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে থাকা জরুরি।

৫৩. তরুণ প্রজন্মকে পঠনমনস্ক করার লক্ষ্যে সর্বত্র গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলার বিষয়ে অগ্রগতি বলা উচিত; সেই সাথে এ বছরের বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা উচিত।

৫৪. অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বাতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সুষম উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে এবারের বাজেটে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি।

৫৫. প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলা গ্রোথ সেন্টার কেন্দ্রিক পল্লী নিবাস ও শহরাঞ্চলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসন গড়ে তোলার বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে এবং দিক-নিদের্শনা সুস্পষ্ট হতে হবে।

৫৬. সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য নীতি নবায়ন ও জাতীয় ওষুধ নীতি (২০০৫) যুগোপযোগিকরণ করা প্রয়োজন।

৫৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি জরুরি।

৫৮. বেকার যুবকদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন করার ব্যাপারে অগ্রগতি বলা প্রয়োজন। সেই সাথে এ বছরের বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ পথ-পদ্ধতি বলা দরকার।

৫৯. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রকট দারিদ্রপীড়িত এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসৃজনে এ বছর সুনির্দিষ্ট কার্যকর প্রস্তাবনা থাকতে হবে।

৬০. ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী বিশেষত: নারীদের জন্য কর্মসৃষ্টির প্রয়াস জোরদারকরণে বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেন মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫% পান এবং সুদের হার ৮-১০% এর মধ্যে রাখা উচিৎ।

৬২. বিদেশে নারী শ্রমিক প্রেরণ এবং পোষাক শিল্পে কর্মরত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বরাদ্দ বাড়ানো জরুরী।

৬৩. পথশিশুদের নিরাপত্তা আবাসন হিসেবে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন জরুরি ভিত্তিতে দেখা প্রয়োজন।

৬৪. অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংস্থান এবং শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য সেল্টার হোম নির্মাণ বিষয়টি এবছরের বাজেটেও থাকতে হবে।

৬৫. সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার আওতায় আনা এবং দেশের হাজার হাজার অচিহ্নিত গণকবর চিহ্নিত করার ব্যাপারে এ বছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি।

৬৬. আর্সেনিক মুক্ত পানির উৎস নির্মাণ প্রসঙ্গে বাজেট ভাবনা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

৬৭. "একটি বাড়ী একটি খামার" কার্যকর করা জরুরি।

৬৮. গো-সম্পদ উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার।

৬৯. রপ্তানীর জন্য নতুন গন্তব্য দেশ অনুসন্ধান উৎসাহিত করতে হবে।

৭০. রপ্তানী-বাস্কেট বহুমুখীকরণ এবং সেই সাথে যারা উচ্চ-মূল্যের রপ্তানী পণ্য উৎপাদন করবেন তাদের প্রণোদনা দিতে হবে।

৭১. সমুদ্র ও স্থল বন্দরের কন্টেইনার সিস্টেম আধুনিকায়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমুদ্র-স্থল-আকাশ বন্দরে স্টোরেজ-ফ্যাসিলিটি উন্নয়ন প্রয়োজন।

৭২. যারা বিদেশে শ্রম শক্তি প্রদানে যাবেন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৭৩. প্রবাসে কর্মরতদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের প্রস্তাব এবং সরকারের বাজেট ঘোষণার মধ্যে দুরত্ব কম। বাজেটের তাত্ত্বিক দিক, উদ্দেশ্য, বরাদ্দ ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণা মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাজেটের বিশেষ করে এডিপি বাস্তবায়ন হার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারী প্রস্তাবনাসমূহ, পিপিপি বাস্তবায়নযোগ্য করার নিমিত্তে নীতিমালা প্রণয়ন, জেলাওয়ারী বাজেট প্রণয়নে বাধাসমূহ দূরীকরণ, জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে সরকারী পদক্ষেপসমূহ, সম্প্রসারনশীল বাজেট আকার, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম, খাস-জমি বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবনাসমূহকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তার অর্থ এই নয় যে, বাজেটের কোন দুর্বলতা বা downside ঝুঁকি নেই। চুড়ান্ত বাজেট প্রণয়নে সেগুলো অবশ্যই

বিবেচনায় এনে কার্যকর আরও কিছু পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত করে বাজেটকে এর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাজেটের অনুমান ভিত্তি

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্ত:স্থ কয়েকটি অনুমানকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। ভিত্তিগুলো নিম্নরূপ: মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাড়াচ্ছে; কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে; অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার সক্ষমতা থাকবে; আগামী অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৬.৭ শতাংশ; রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে; PPP সহ বিভিন্নভাবে বেসরকারী খাতে ঋণ যোগান বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বাড়বে; মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকবে; কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে; ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশ পৌছবে এবং রাজস্ব আহরণ গড়ে জিডিপির ০.৫ শতাংশ হারে বাড়বে একই সময়ে এডিপি-র বরাদ্দ জিডিপি-র ৪.১ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশে উন্নীত হবে, বিনিয়োগ হার জিডিপির ২৪.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২ শতাংশ পৌছবে; এবং মূল্যস্ফীতি আগামী অর্থবছরে ৬.৫ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে (এবং ক্রমান্বয়ে তা কমিয়ে আনা হবে)।

অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেক গুরুর মতে প্রক্ষেপনের অনুমান ভিত্তি অনেক সময় কাজ করে না। যে কারণে বলা হয় "অর্থনীতিবিদদের কাজ হলো গত কাল অনুমানের ভিত্তিতে যে প্রক্ষেপন করা হয়েছিলো তা কেন আজ কাজ করলো না সে বিষয়ে ভবিষ্যতে বিচার-বিশ্লেষণ করা" এসব কথা সত্য হতে পারে যখন প্রক্ষেপণের অনুমান ভিত্তি হয় বাস্তবতা বিবর্জিত। বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ও দুর্বল দিকসমূহসহ অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ বিভিন্ন সমীকরণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব যে সঞ্চয় হার যখন ক্রমবর্দ্ধমান (এমন কি বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি), যখন বিনিয়োগ স্থবিরতা দূর হবার লক্ষণসমূহ স্পষ্ট, যখন রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি কমতে শুরু করেছে, যখন রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ার লক্ষণ স্পষ্ট, যখন কৃষির গতি বাড়ছে, যখন মেয়াদি শিল্প ঋণ বাড়ছে, যখন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, যখন বিনিয়োগে সম্ভাব্য "ভীতি ফ্যাক্টর" কমছে এবং সেইসাথে যখন বাড়ছে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও সুরক্ষার উপাদান–এ অবস্থায় বাজেটের অনুমান ভিত্তিসমূহ আমাদের মতে কাঙ্খিত মাত্রায় যুক্তিসংগত এবং বাস্তবসম্মত।

বাজেটের আয় ও ব্যয় – আমাদের বিশ্লেষণ

এ বছর বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৭০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৬.৯%) যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৯.৬ শতাংশ বেশি। যেখানে অনুন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট খাতের মোট বরাদ্দ ৯৩ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১২%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ ৩৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৪.৯%)। বাজেটের আকারের সাধারণ গতিধারা এবং মূল্যস্ফীতির নিরিখে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ যেমন একদিকে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হবে তেমনি অনুন্নয়ন খাতের ১৫.৪ শতাংশ আসলে দারিদ্র দূরীকরণ উদ্দিষ্ট উন্নয়ন ব্যয়। এ বছর বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক, কারণ নূতন বেতন কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে, সুদ পরিশোধ ব্যয় বাড়বে, কৃষি ভতুর্কিসহ ভাড়া ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভতুর্কি দিতে হবে, সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাড়ার কারণে বর্দ্ধিত সুদ পরিশোধ করতে হবে।

এ বছর বাজেটে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯২ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৯%)। এ আয়ের ৭২ হাজার ৫৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৩%) আসবে কর-রাজস্ব হিসেবে, আর কর-বহির্ভুত খাত থেকে রাজস্ব আয় হবে ১৬ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৬%)।

আমাদের বাজেট–একটি ঘাটতি বাজেট। মোট প্রাক্কলিত ঘাটতির পরিমান ৩৯ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৫%)। ঘাটতি পূরণে সহজ শর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক সুত্র থেকে আহরণ করা হবে ১৫ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২%) এবং অভ্যন্তরীণ সুত্র থেকে ২৩ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৩%)। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া হবে ১৫ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২%) এবং ব্যাংক বহির্ভুত খাত থেকে নেয়া হবে ৮ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি-র ১% যার বেশির ভাগ আসবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে)। এ ক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো ঘাটতি বাজেটের সাথে মূল্যস্ফীতি তেমন সর্ম্পকিত নাও হতে পারে যদি ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে উৎপাদনশীল খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। এ দিকে নজর রাখতে হবে।

বাজেট কনকল্যাণকামী এবং ভারসাম্যপূর্ণ কি'না–এ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি-র) বরাদ্দ বিন্যাস এবং মোট বাজেটের (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। আমরা আগেই বলেছি বাজেটকে হতে হবে উন্নয়নের দিক-নিদের্শক দলিল।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ বিন্যাসে প্রধান খাত হচ্ছে শিল্প, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ **মানবসম্পদ উন্নয়ন খাত** যেখানে বরাদ্দ ২৪.২ শতাংশ। আমরা মনে করি মানবসম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির এ বরাদ্দ অগ্রাধিকার যুক্তিযুক্ত, কারণ ব্যপক জনসংখ্যার এ দেশে যখন ধীরে ধীরে জনমিতিক উত্তরণ ঘটছে তখন উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদে জনমিতিক লভ্যাংশ (demographic divident) সর্ব্বোচকরণের বিকল্প নেই। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামোতে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে **কৃষি খাতকে** (২১.২% বরাদ্দ) যার মধ্যে আছে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, পল্লী প্রতিষ্ঠান এবং পানি সম্পদ। এ অগ্রাধিকারও যুক্তিযুক্ত কারণ দেশের ৭৫ শতাংশ মানুষের বাস পল্লী অঞ্চলে। বরাদ্দ তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে **বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত** যে খাতে বরাদ্দ ১৫.৭৮ শতাংশ। যেখানে বিদ্যুত-জ্বালানি স্বল্প প্রাপ্তির কারণে জনভোগান্তি বেড়েছে এবং শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে গতি হ্রাস পাচ্ছে এবং একই সাথে যেখানে নির্বাচনী ইশতেহারে তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিদ্যুৎ-জ্বালানির কথা বলা হয়েছে সেখানে এ অগ্রাধিকার যুক্তিযুক্ত এবং প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরপরেই চতুর্থ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১৫ শতাংশ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো **যোগাযোগ** (সড়ক, রেল, সেতু, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ)। আমরা মনে করি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামোয় বৃহৎ খাত ওয়ারি যে বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে তা যেন শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন না হয়- সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন নিয়ে যে মোট বাজেট তার ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিম্নরূপ। প্রস্তাবিত বাজেটে সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোতে সর্ব্বোর্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে **সামাজিক অবকাঠামো খাতে** যার অন্তভুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত। সামাজিক অবকাঠামো খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৩%)। যে যুক্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে সর্ব্বোর্চ বরাদ্দ যুক্তিযুক্ত ঠিক একই যুক্তিতে সামাজিক অবকাঠামো খাতের এ বরাদ্দ সুচিন্তিত। বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোতে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হলো **ভৌত অবকাঠামো খাত** যেখানে বরাদ্দ প্রস্তাব মোট বরাদ্দের ৩০.৪ শতাংশ। এ খাতের মধ্যে আছে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত (১৯.৯%), বৃহত্তর যোগাযোগ খাত (৭%), বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত (৪.৬%)। ভৌত অবকাঠামোর এ অগ্রাধিকার যুক্তিসঙ্গত। সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোতে তৃতীয় প্রধান খাত হলো **সাধারণ সেবা খাত** যেখানে প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ২১.১ শতাংশ–যার মধ্যে ৯.৬ শতাংশ বরাদ্দ পাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা এবং পে-কমিশনের সুপারিশ পুর্নাংগ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ব্যয়। এব পরেই আছে **সুদ পরিশোধ ও নীট ঋণদান** (মোট বরাদ্দের ১৫.১%)। প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক

ব্যয় কাঠামোর যে বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করছি তাতে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে এ কাঠামো 'রূপকল্প ২০২১' বিনির্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই আমরা মনে করি মোট বাজেটের যে কাঠামো-বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে তা যেন পরিবর্তিত না হয় এবং একই সাথে তা যেন পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়-এ দিকে সব্বোর্চ সমন্বিত নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খাত ওয়ারী ব্যয়-বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য

প্রস্তাবিত বাজেটের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "কতিপয় প্রধান খাত" এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 'জনকল্যাণ ও সুশাসন' শিরোনামে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বেশ কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা কিছু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ:

১. 'কতিপয় প্রধান খাত' শিরোণামের প্রথম ও প্রধান খাত হিসেবে আনা হয়েছে বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত। "বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে পথ নকশায়" পাঁচ বছর মেয়াদি চিন্তার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যুত ঘাটতির কারণে জনভোগান্তিসহ শিল্প-ব্যবসায় ক্ষতি স্বীকার করে অর্থমন্ত্রী "স্বীকারোক্তির এক সংস্কৃতি" শুরু করলেন যা এদেশে বেশ বিরল।

   বিদ্যুৎ খাতকে রাষ্ট্রিয় জরুরী খাত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জরুরী হিসেবে বিদ্যুৎ ভাড়া/ক্রয়/উৎপাদনে সরাসরি ক্রয়ের পাশাপাশি কয়লা এবং আমদানিকৃত এলএনজি-কে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎস হিসেবে দেখা হচ্ছে; বলা হয়েছে আনবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা এবং নবায়ন যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন–সব মিলে সমন্বিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতিমালার কথা। জোর দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সাশ্রয়ের উপর; বলা হয়েছে পল্লী বিদ্যুত-এর কাঠামোগত সংস্কার-এর কথা। এ বছর বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে মোট ৬ হাজার ১১৫ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৬১.৫ শতাংশ বেশি।

২. এ বছর বাজেটে "কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন" নিয়ে সমন্বিত ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। যে ভাবনার আওতায় চাষের কৃষির পাশাপাশি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে গ্রামীণ অকৃষি খাত, পল্লী উন্নয়ন তথা পল্লী অবকাঠামো, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ আবাসন (বসতি), ভূমি ও পানি সম্পদের ব্যবহার এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পাশাপাশি জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

কৃষিতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে কৃষি মন্ত্রণালয়য়ের অনুকূলে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৭ হাজার ৪৯২ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বরাদ্দের মধ্যে আছে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৪ হাজার কোটি টাকা, ১২ হাজার কোটি টাকার কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, সেচ-জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩০০ কোটি টাকা, কৃষি গবেষণায় ৪১২ কোটি টাকার তহবিল, কৃষি বীমা চালু করা এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'কৃষক বিপনন দল' ও কৃষক ক্লাব' গঠন।

৩. পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১০ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৮.৮ শতাংশ বেশি।

৪. এ বছর প্রস্তাবিত বাজেটে দারিদ্র নিরসন ও কর্মসংস্থান খাতে ১২ ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির কথা আছে; পাশাপাশি আছে 'ঘরে ফেরা' এবং 'একটি বাড়ী একটি খামার' কর্মসূচীর কথা। বলা হয়েছে ৬ কোটি ২১ লক্ষ জনমাস কাজ সৃষ্টির কথা। এসব মিলে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে মোট ১৯ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১৪.৮ শতাংশ (জিডিপি-র ২.৫%)।

৫. নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্কহার শূন্য শতাংশ করা এবং পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদানের কারণে আশা করা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

৬. এবারের বাজেটেই সম্ভবত প্রথমবারের মত স্পষ্ট বলা হয়েছে যে চলতি অর্থবছরে সারাদেশে ৩৪ হাজার ৫৩২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার ৫৩৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে। বলা হয়েছে এর ফলে দারিদ্র নিরসনের পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভূমিহীন কৃষককে খাস জমি এবং জলাহীন জেলেকে খাস জলা প্রদান – নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি ছিল এ লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন–যা বাজেটে উল্লেখ নেই।

৭. সম্ভবত এবারেই প্রথম যখন বাজেটে অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যপন সর্ম্পকে বলা হলো; বলা হয়েছে প্রর্ত্যপন আইন ২০০১ সংশোধনের কথা।

৮. বাজেটে দেশজ শিল্প সুরক্ষাসহ ভারি শিল্প উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। তদনুযায়ি আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর কাঠামোর বিন্যাসের কথা আছে।

শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের উৎপাদন বিকাশের অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে; ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশে টার্নওভার করের পরিধি সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে; ভারি শিল্প স্থাপন ও বিকাশে উৎসাহ প্রদানের কথা বলা হয়েছে; দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে রেগুলেটরি ডিউটির কথা বলা হয়েছে; দেশীয় পরিবহন শিল্পকে সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আর এ লক্ষ্যে আমদানি নিরুৎসাহিত করণের জন্য শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৯. বিলাসদ্রব্য ও স্বাস্থ্য-ক্ষতিকর পণ্যের উপর শুল্ক হার বাড়ানো হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১) বাজেট বাস্তবায়নের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত পদক্ষেপসমূহের

(যেমন ঃ প্রতি সপ্তাহের একনেক সভায় ২টি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ নজরদারির জন্য টাস্কফোর্স গঠন, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সর্বাধিক ব্যয়সাপেক্ষ ৫০টি প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা বা অনুবিভাগ সৃষ্টির, ইত্যাদি) পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদার করার ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

২) বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি অন্যতম পথ "Cost of doing business" কমিয়ে আনা। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানের অবক্ষয়কে "খুবই দুশ্চিন্তার" বিষয় বলে বর্ননা করেছেন। এ অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের কার্যকরী পদক্ষেপ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা এবং তা বাস্তড়বায়ন প্রয়োজন। তাছাড়া সাধারণ আইন শৃংখলার আরও উন্নয়ন এবং দুর্নীতি হ্রাসে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল" গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩) এবারের বাজেটে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি আরও বাড়ানের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদের একটি "ডাটাবেজ" তৈরীর পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি আরও যা করা প্রয়োজন তা হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির প্রকৃত চাহিদার প্রক্ষেপন। তাছাড়া এর সুবিধাভোগীদের উপরোক্ত সুবিধা ভোগ করার জন্য প্রচন্ডরকম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অমানবিক অসুবিধা পোহাতে হয়। সুতরাং

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধি করার সাথে সাথে এর সহজগম্যতাও নিশ্চিত করতে হবে। যেমন বয়স্কভাতা যারা পান তার দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে এসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

৪) বাংলাদেশের বাজেট এই প্রথম ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস-জমি বিতরনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২২, ২৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০, ২২৭ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রধান করেছে। চলতি অর্থবছরে সারাদেশে আরও ৩৪, ৫৩২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫,৫৩৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলা আছে। অন্যদিকে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সুতরাং দারিদ্র নিরসন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে অধিক হারে খাস জমি বন্দোবস্তড় করতে পারে। এ কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনি ইশতেহারে ছিল।

৫) দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার কারনে তাঁদের শস্যমূল্য সহায়তার জন্য "কৃষি বীমা" চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। উপরোক্ত সহায়তা কার্যক্রম ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সম্প্রসারন করা প্রয়োজন।

৬) সরকারের দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প অর্থায়নে বন্ড মার্কেট উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারন করা প্রয়োজন। এর ফলে একদিকে যেমন Equity Market-এর উপর নির্ভরশীলতা কমবে আর অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (বিশেষত: ব্যাংকসমূহ) তাদের portfolio বৈচিত্রকরনে সক্ষম হবে।

৭) প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বাজেট ঘাট্তি অর্থায়নে বা PPP অর্থায়নে ব্যবহার করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে।

আমাদের শেষ কথা

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ করার স্বপ্ন দেখছি। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ, আর এ কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দেবেন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকেরা। এ বিনির্মান এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে এ বিনির্মাণের পথ-কৌশল। এ নিরিখে এ বছরের বাজেটে

বেশ কিছু সাহসী এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ রয়েছে। একারণেই এ বছরের বাজেট আশা সঞ্চারণকারী দলিল। এবারের বাজেট অনেক দূর পর্যন্ত "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত" দলিল। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে। 'রূপকল্প ২০২১' যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এ বিশ্বাস অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানবিক যে কোনো মানদণ্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুপারিশমালা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী **

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট হবে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের তৃতীয় বাজেট। গত দুইটি বাজেটেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত মহাজোটের দিন বদলের সনদ "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন। রূপকল্প ২০২১-এর মূল কথা হল-মুক্তিযদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী নাগাদ অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার, গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র। "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জনকল্যাণকামী অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মানে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-তথ্য-প্রযুক্তিসহ দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসে ২২টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। সে সাথে ইশতেহারে পাঁচটি সুনর্দিষ্ট অগ্রাধিকার উল্লেখ করা হয়েছিলোঃ (১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবেলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, (২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, (৪) দারিদ্র ঘুচাও বৈষম্য রুখো, এবং (৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

গত দুই বছরের বাজেটের ন্যায় এবারের ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটেও থাকতে হবে নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত বর্তমান মহাজোট সরকারের দিন বদলের সনদ- রূপকল্প ২০২১-এর প্রতিফলন। এখানে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন, ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে সনাতনী বাজেটের পরিবর্তে তিন

---

* সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম, ঢাকা, তারিখ: ২৮ মে ২০১১

বছর মেয়াদী মন্ত্রণালয় ভিত্তিক মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় (MTBF) বাজেট প্রণয়নের সূচনা হয়। এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো এবং সরকারের নীতি-কৌশলে বিধৃত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অর্জন নিশ্চিত করা। চলতি (২০১০-১১) অর্থবছরের বাজেট উপরোক্ত কাঠামোর আওতায় মোট ৩৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে প্রনীত হয়েছে। এবার (২০১১-২০১২) থেকে আশা করা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হবে এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে এমটিবিএফ-এর আওতাভূক্ত করা হবে। ৯ই জুন, ২০১১ মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিতব্য ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে উপরোক্ত প্রত্যাশার প্রতিফলন আশা করে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক-বাজেট সুপারিশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

১। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতগুলো ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। সরকারি হিসাবে দারিদ্র্য ২০০৫ সালে যেখানে ৪০ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০১০ সালে এসে তা ৩১ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়ায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ ধরে রেখেছে। এ বছর প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বছর প্রকৃত কৃষি মজুরি বেড়েছে। এটা কর্মসংস্থান বাড়ার ইঙ্গিত দেয়। সম্প্রতি রপ্তানি বেড়েছে। গত ছয় মাসে তা বৃদ্ধির পরিমাণ ৪১-৪২ শতাংশ। এর পাশাপাশি মূলধনি আমদানি বেড়েছে। চলতি বছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি আদায় করা গেছে। এগুলো ভালো দিক। এসমস্ত ইতিবাচক দিকগুলো বজায় রাখার জন্য বাজেটে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। গত কয়েক বছরে আয় যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি বেড়েছে বৈষম্য। কিছু মানুষের কাছে অর্থ গেছে, কিন্তু সবার কাছে ন্যায্যভাবে যায়নি। সামাজিক বৈষম্য কমানো সরকারের অঙ্গীকার। এ ক্ষেত্রে সরকার নিজের অঙ্গীকার পূরণে আরও উদ্যোগী হবে বলে আশা করি।

৩। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের মতো। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, এটা ৫ শতাংশ হলে তা গ্রহণযোগ্য, তার বেশি নয়। বাজেট ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সরকার পেট্রোল ও গ্যাস-এর মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়েছে বাস, ট্রাক, সিএনজি চালিত অটোরিক্সার ভাড়া। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারেও খাদ্য-দ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল্য পরিস্থিতির এ নাজুক অবস্থায় আগামী অর্থ-বছরে (২০১১-২০১২) মূল্যস্ফীতি রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

৪। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো মূলত সংকোচনমূলক ব্যবস্থা। সংকোচনমূলক ব্যবস্থা অর্থনীতির গতি হ্রাস করতে পারে। সরকারকে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস না পায়, আবার মূল্যস্ফীতি হ্রাস করা যায়। শুধু আর্থিক নীতি দিয়ে কাজ হবে না। যথোপযুক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা ও বাজার হস্তক্ষেপও কাম্য।

৫। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের হাতে একটি হাতিয়ার হবে টিসিবির মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগপণ্য আমদানি করে তা ন্যায্যমূল্যে বিতরণ করা। দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণে সক্ষম হবে এমনভাবে পুর্নবিন্যাস করে টিসিবিকে ব্যবহার করা উচিত। আশা করি, এদিকে নজর দেওয়া হবে। আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে বাজার তদারকি এবং সেই আঙ্গিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। এবার বোরো ফসল খুব ভালো হয়েছে এবং পাশাপাশি সরকারের ওএমএস কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে। তাই চালের দাম কিছুটা কমে এসেছে। ওএমএসসহ অন্যান্য ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, যাতে চালের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকে। তাছাড়া, শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শ্রমিকদের জন্য চাল, ডাল, তৈল ও চিনির মত প্রয়োজনীয় পণ্য রেশনিংয়ের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭। বিভিন্ন সুত্রে জানা যায়, এবার এক লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকার বাজেট হতে যাচ্ছে। দেশের বিরাট জনসংখ্যার নানা প্রয়োজন বিবেচনায় এই অংক বেশি নয়। তবে বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হতে হবে। এবার বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০ থেকে ২২ শতাংশ বাড়িয়ে ধরা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বর্তমান রাজস্ব আদায়ের ধারাবাহিকতায় সরকার তার কার্যক্রম জোরদার করলে এটা অর্জন করা সম্ভব বলে মনে হয়। আর বাকি অর্থ আসবে ব্যাংক থেকে অথবা বৈদেশিক সহায়তা থেকে। জানা যায় এবার বাজেট ঘাটতি ধরা হবে জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ। এটা গ্রহণযোগ্য, এর বেশি হলেই সমস্যা। তবে বাজেট ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে।

৮। ঠিকমতো বাজেট বস্তবায়ন করার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য যতই ভালো হোক, বরাদ্দ যতই দেওয়া হোক বাস্তবায়িত না হলে সুফল পাওয়া যায় না। কাজেই বছরের শুরু থেকেই কার্যকর উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ চাই। সেই লক্ষ্যে কার্য্যকর কৌশল গ্রহণ/শক্তিশালী করার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

৯। সম্প্রতি ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া বেড়েছে। এর ফলে দুই ধরণের সমস্যা তৈরি হয়-একদিকে মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের অর্থ পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। সরকার যাতে পরিমিত

পরিমাণে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেয়, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। বৈদেশিক সহায়তা অধিক পরিমাণে ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

১০। এবার রেমিট্যান্স কিছুটা বাড়লেও বাড়ার হার আগের থেকে অনেক কম। এবার ৪ শতাংশ বেড়েছে, গতবার ছিল ১৯ শতাংশ। রেমিট্যান্স যেন আরও বাড়ানো যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলির ওপর নজর রাখতে হবে এবং কয়েকটি দেশে নতুন গন্তব্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুখবর হলো, মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর ব্যাপারে সমস্যা মিটে গেছে এবং নতুন নতুন গন্তব্যে জনশক্তি পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দেখতে হবে যাতে জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো যায়। প্রতারক এজেন্সি গুলোর প্রতারণার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সত্যিকার অর্থে প্রবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে।

১১। পিপিপির সম্ভাবনা প্রচুর। তবে যেভাবে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে এখন পর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি বেশ কিছু প্রকল্প, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে, পিপিপির আওতায় গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রক্রিয়া আগামী বছর আরও জোরদার হবে এবং পিপিপির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হবে। পিপিপি-র নীতিমালার আওতায় ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে পিপিপি-সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের সংবিধানিক দায়-দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপানোর সামিল।

১২। আগামী অর্থবছরের (২০১১-২০১২) বাজেটে করের আওতা বাড়ানো উচিৎ। একই সাথে সংগ্রহের পদ্ধতিও সহজ করা উচিৎ। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়ানো উচিৎ। মহিলা ও প্রবীনদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা সাধারণ ব্যক্তি করদাতাদের আয়ের সীমা থেকে বেশী হওয়া প্রয়োজন।

১৩। কর অবকাশের মেয়াদ এ অর্থবছরে শেষ হবে। বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতে কর অবকাশ আরও ১/২ অর্থবছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

১৪। শতভাগ বাজেট বাস্তড়বায়ন-সরকারের এ অঙ্গীকার গত দুই অর্থ-বছরে সরকার রক্ষা করতে পারেনি। বাংলাদেশ অর্থনীত সমিতি সরকারের সম্প্রসারণমূলক বাজেট আকারকে উচ্চভিলাষী মনে করে না, বরঞ্চ বাজেট বাস্তবায়ন (implementation) কাঠামোকে দুর্বল মনে করে। ইতিমধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও

অনুমোদন প্রক্রিয়ায় কিছু গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে তা এখন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও অনেক বেশী জোরদার করতে হবে। বাজেট প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কিভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth) লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সম্পৃক্ততা অবশ্যই প্রয়োজন।

১৫। সরকারি ব্যয় কমানোর সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। এ প্রসংগে জনপ্রশাসন সংস্কার-এর অংগীকার বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। একাজটি গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নেয়া জরুরি। বাজেটে এর প্রতিফলন থাকা উচিত।

১৬। কর আয় বাড়ানোর জন্য এনবিআর-এর মানব ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর প্রশাসনের সততা নিশ্চিত করা, কর পরিধি বৃদ্ধি, অন-লাইন কর প্রদান এবং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বিলাসদ্রব্যের উপর করারোপ বা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৭। সকল বিত্তবান/স্বচ্ছল ব্যক্তিকে আয়করের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যের আলোকে জরিপ চালাতে হবে। এবং তথ্য ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেককে টিআইএন দিতে হবে। কর প্রশাসনকে উপজেলা এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে।

১৮। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রাক-বাজেট পর্যালোচনায় সরকারের কাছে কর ও অন্যান্য সুবিধা দাবী করে থাকে। এবছর ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে এ সমস্ত যুক্তি বা দাবী যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

১৯। আমাদের দেশে cost of doing business কমানোর লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং এর ফলাফল কি এ–সম্পর্কে বাজেটে উল্লেখ থাকতে হবে।

২০। পূর্বের ন্যায় বর্তমান অর্থবছরেও সঞ্চয় হার বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি। এ ভারসাম্যহীনতার কারণে সঞ্চয়ের বেশ বড় অংশ speculative market-(যথা বিয়েল স্টেট, সেকেন্ডারী পুঁজি বাজার, স্বর্ণ ক্রয়)-এ যাবার প্রবণতা বেড়েছে। সুতরাং সঞ্চয়কে অধিকহারে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নেবার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ থাকতে হবে।

২১। স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়েপড়া এলাকাগুলোতে "অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পারে। এ পদক্ষেপ দেশে সামাজিক ও ভৌগলিক বৈষম্য ঘুচাতে সহায়ক হবে।

২২। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিশেষ করে শিল্প পার্ক গড়ে তোলা দরকার। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।

২৩। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি পূর্বের ন্যায় এবারও বলছে, বাজেটে কালো টাকার বা অঘোষিত টাকা সাদা করার সুযোগ থাকা উচিৎ নয়। এ ধরণের সুযোগ একদিকে সৎ করদাতাদের কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করে এবং অন্যদিকে দুর্নীতিকে উৎসাহিত ও সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। বিগত বছরগুলোতে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ কোন লক্ষণীয় সুবিধা অর্থনীতির জন্য বয়ে আনেনি। একইভাবে বিও একাউন্টধারীদের টিন থাকা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ।

২৪। আমাদের উন্নয়ন বাজেটে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতি খাত। বর্তমান বাজেট কাঠামো ও বরাদ্দবিন্যাসে তা প্রতিফলিত হয়, তবে আরও জোরদার করতে হবে। বিনিয়োগ বাড়ানো, ভর্তুকিসহ অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি গ্রামীনকৃষি বহির্ভুত খাতগুলোর উপরও বিশেষ নজর দিতে হবে। কিছু কিছু সরকারী কর্মসূচী যেমনঃ একটি বাড়ী-একটি খামার, কর্মসৃজন ইত্যাদির বিপুল সম্ভাবনা আছে। তবে এর বাস্তবায়ন আরও জোরদার করতে হবে।

২৫। দারিদ্র-পীড়িত এলাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলাকায় সরকারি ভর্তূকী বিশেষ করে কৃষি উপকরণ বিতরণে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ও দারিদ্র-পীড়িত কৃষকদের স্বল্পসুদে বা সুদবিহীন ঋণ প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২৬। গতবারের ন্যায় এবারও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শষ্য-বহুমুখীকরণের দরকার। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য "কৃষি বীমা" চালুর সরকারী অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৭। কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিশেষতঃ তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার প্রয়াস বাজেটে থাকতে হবে। কৃষি বিপনন ব্যবস্থার

সংস্কার অপরিহার্য। গত বছরের সরকারি অঙ্গীকার–"কৃষক বিপনন দল" ও "কৃষক ক্লাব" স্থাপন সম্পর্কে আমরা জানতে আগ্রহী।

২৮। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পর আমাদের বিবেচনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে আমরা জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করি। এ সরকারের অন্যতম অর্জন নূতন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন

২৯। গ্রামীন স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগে তেমন কোন অগ্রগতি নেই। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্চনীয়।

৩০। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি কর্মসূচীসমূহ দরিদ্র জনগোষ্টীকে নিরাপত্তা প্রদানসহ তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করে। এ লক্ষ্যে অনেক কর্মসূচী রয়েছে-এগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে এবং এগুলো যাতে সঠিকভাবে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আগামী অর্থবছরে (২০১১-১২) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি কর্মসূচীর আওতা বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ এমূহুর্তে সামাজিক নিরাপত্তবেষ্টনি সুবিধা পাবার যোগ্য ৩ কোটি ২০ লক্ষ খানার মধ্যে মাত্র ৭৮ লক্ষ খানা অর্থাৎ ২৫ ভাগ খানা এ সুবিধা পেয়ে থাকে।

৩১। অর্থবছর ২০১০-১১ বাজেটে প্রথম ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে সারা দেশে ৩৪,৩৫২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫,৫৩৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দবোস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। অগ্রগতির চিত্র ব্যাখ্যাসহ বাজেটে উল্লেখ করে আগামী বাজেটে এক্ষেত্রে অগ্রগতি তরান্বিত করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

৩২। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলা আছে। অন্য দিকে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সুতরাং দারিদ্র নিরসন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে অধিক হারে খাস জমি বন্দবোস্ত করতে পারে। এ কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল।

৩৩। জনস্বাস্থ্য গবেষকরা জানান, সরকারের উদার করনীতির জন্য বাংলাদেশে তামাক সেবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সিগারেটের ক্ষেত্রে মোট ৪টি সম্পূরক কর স্ল্যাব আছে। এ স্ল্যাবসমূহের কর উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো উচিৎ। এর ফলে সরকারি রাজস্ব বাড়বে এবং অন্যদিকে সিগারেট সেবীর সংখ্যাও কমে যাবে।

৩৪। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও ব্যাপকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। সেজন্যে পরিবেশ বান্ধব বাজেটের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গত দুটি অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া আরও কিছু প্রসংশনীয় উদ্যোগ যেমনঃ চিংড়ীচাষ জনিত পরিবেশ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার উপায় বের করা, পানি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বাস্তবায়নে বাস্তব পরিকল্পনা বা আর্থিক বরাদ্দ থাকা বাঞ্চনীয়।

৩৫। গত দুইটি বাজেটেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন, দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ না হলেও কিছু বরাদ্দ ছিল। এসমস্ত কর্মসূচীর অগ্রগতি মূল্যায়ণ প্রয়োজন।

৩৬। হাতিরঝিল প্রকল্পের বাস্তবায়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি), হাজারীবাগ ট্যানারী স্থানান্তর, এসমস্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি জানা প্রয়োজন।

৩৭। ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবারাহের কর্মসূচি যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে সনোফিল্টারের সহজলভ্যতা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

৩৮। বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় চলতি অর্থবছরে বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু এখাতে বরাদ্দ ছিল অল্প, তাছাড়া বনায়ন কর্মসূচীর বড় প্রতিবন্ধকতা হলো দুর্নীতি ও বন ধ্বংসের বেআইনি কার্যকলাপ।

৩৯। পরিবেশবান্ধব বাজেট বাস্তবায়নের জন্য শুধু অর্থমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও আর্থিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ন ও সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কার্যকলাপ প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

৪০। বর্তমান অর্থবছরে (২০১০-১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতকে রাষ্ট্রীয় জরুরী খাত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সরকার স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলেছিল। সরকার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদকের মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বর্তমানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া

নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম ও সিস্টেম লস কমানো ইত্যাদি পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। এত কিছু করার পরও এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতিই আমাদের দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। সেজন্য আগামী অর্থবছরেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাত সবিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। স্বল্প মেয়াদে রেন্টাল ও কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সমর্থনযোগ্য হলেও মধ্যম ও বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রতি নজর দেয়া উচিৎ। তাছাড়া, এয়ার কন্ডিশন আমদানীর ক্ষেত্রে করারোপ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নিজস্ব জ্বালানি ব্যবস্থা ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৪১। বর্তমান অর্থবছরের বাজেট জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ এর আওতায় সরকার বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। তাছাড়া, তথ্য প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ও যথেষ্ঠ বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে। এ ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি খাতেকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ খাতের কর অবকাশ (যা বর্তমান বছরের ৩০শে জুন সমাপ্ত হবে) আরও ৫ বছর বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান ১৫ শতাংশ ভ্যাটও কমানোর প্রয়োজন।

৪২। সরকারের বাজেট বাস্তবায়নের ও সরকারী ব্যয় অর্থায়নে আর্থিক খাতের বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমান অর্থবছরে পুঁজি বাজারের উত্থান ও তৎপরর্তীতে পতন শুধুমাত্র সচেতন দেশবাসীর দৃষ্টিই আকর্ষন করেনি সাথে সাথে অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে নিঃস্ব ও সম্বলহীন করে দিয়েছে। পুঁজি বাজার সংস্কারের জন্য সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের অনতিবিলম্বে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। পুঁজিবাজারের পতন বাজার নিয়ন্ত্রণকারীদের স্বাধীনতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবেই সামনে নিয়ে আসে। তাছাড়া, পুঁজিবাজার ও অর্থ-বাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যপারটিও গুরুত্বপূর্ণ।

৪৩। সরকারী পর্যায়ে ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক শৃংখলা আনয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর স্বাধীনতার বিষয়টিও অপরিহার্য। তার অর্থ এই নয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাজস্বনীতিকে অবজ্ঞা করবে। গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ পরিচালিত বিভিন্ন সংস্কারেরকারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গৃহীত বর্তমান নীতিমালাসমূহ যেমনঃ অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন, কৃষি ও বর্গাচাষী অর্থায়ন, সবুজ অর্থায়ন, ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে এবং আনবে।

৪৪। যোগাযোগ খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে সম্প্রাসারিত হয়েছে, তার রেলপথ ও নৌপথের তেমন উন্নয়ন হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমন্বিত উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে একটি Integrated Multimodal Transport Policy প্রণয়নের অঙ্গীকার ছিল। সেটার অগ্রগতি হয়নি। তবে এক্ষেত্রে দৃঢ়পদক্ষেপ জরুরী।

৪৫। ২০১০-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত সরকারের লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা। এজন্য নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার নারী উন্নয়ন নীতিও ঘোষণা করেছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের প্রায় ২৫.৯ শতাংশ ব্যয় করার কথা ছিল জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকল্পে। এর অগ্রগতি জানা প্রয়োজন।

৪৬। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য লাভজনকভাবে বাজারজাত করার জন্য বেসরকারী উদ্যোগে একটি স্থায়ী বিপনন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য কর উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

৪৭। নারীর সাংসারিক কাজের ফলে যে মূল্য সংযোজন হয়, তার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দানের উদ্যোগটি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে টেকসই অর্থনীতির স্বার্থে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এ কাজে অগ্রসর হয়েছে। নারীর অস্বীকৃত কাজের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নারীকে সমাজে সম্মানিত করবে এবং ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতনের মত কঠিন সমস্যাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃত হবে।

৪৮। আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম প্রণেতা ও লেখকদের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। এ শিক্ষার কর্মসংস্থান নেই। গত বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করতে বলা হয়েছে। এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য, দেশে একটি অর্থনৈতিকভাবে সচল, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাজেট একটি। সমাজ বিবর্তনের সব প্রক্রিয়ায় ওই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট : প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. আবুল বারকাত *
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী **
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ***

ভূমিকা

গত ৯ জুন ২০১১/২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট পেশ করলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম জাতীয় বাজেটকে শিরোণামভুক্ত করা হয়েছে-এবারের শিরোণাম **"আগামীর পথে অভিযাত্রাঃ একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী দেশ গড়ার লক্ষ্যে–বাজেট বক্তৃতা ২০১১-২০১২"**। ৬-টি অধ্যায়ে বিভাজিত ৩৫৬ পয়েন্ট সম্বলিত বাজেট বক্তৃতার শুরু ও শেষ হয়েছে মহাজোটের দিনবদলের সনদ "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের আকাঙ্খা নিয়ে। যে আকাঙ্খার পক্ষে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বতর্মান সরকারকে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ গণতান্ত্রিক রায় দিয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১'-এর মূল কথা হল–-মুক্তিযুদ্ধের সুর্বন জয়ন্তী নাগাদ অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র। "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জনকল্যানকামী অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বির্নিমানে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-তথ্য-প্রযুক্তিসহ দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসে ২২টি সময়

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
*** সভাপতি, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস আয়োজিত গোলটেবিল, স্থান: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, তারিখ: ১১ আষাঢ় ১৪১৮/ ২৫ জুন ২০১১

নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। সে সাথে ইশতেহারে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার উল্লেখ করা হয়েছিলো: (১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবেলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, (২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, (৪) দারিদ্র ঘুচাও বৈষম্য রুখো, এবং (৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি- এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবি সংগঠন। আমাদের সমিতি মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা অর্থাৎ বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো বিনির্মানে বিশ্বাস করে। আর একই কারণে উল্লেখিত "রূপকল্প ২০২১"-এর চেতনা ধারণ করে। সে কারণেই আমাদের সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের গোলটেবিল এবারের বাজেট-উত্তর প্রতিক্রিয়া সে নিরিখেই বস্তুনিষ্ঠতার সাথে উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত–এ বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে গত বছর আমরা বলেছিলাম "বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী এবং নির্বাচনী ইশতেহারের রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে এখন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ প্রায় শেষের দিকে। বাজেটের দর্শন-গত ভিত্তি হিসেবে উল্লেখিত দলিলসমূহের অন্তনিহিত চেতনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বাজেট দলিল হবে যোগসূত্রহীন"। সেই সাথে আমরা আরো দু'টি সুনির্দিষ্ট বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলাম: (১) গত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাল-অবস্থা এ বছরের বাজেটে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, এবং (২) গত বছর ছিল না অথচ "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জরুরী এমন কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা। উল্লেখ্য যে এ দু'টি বিষয়কে এবছরের বাজেটে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গত বছর আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের সমিতির প্রাক-বাজেট প্রেস-কনফারেন্সে (১৯ মে ২০১০) আমরা উপসংহারে বলেছিলাম "দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দিন বদলের সংস্কৃতি। এ রূপান্তর এক বাজেটের বিষয় নয়-কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে "বদলের নির্দেশকারী" দলিল। আগামী বাজেট হতে হবে "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ণ দর্শন উদ্ভুত দলিল। ...রূপকল্প ২০১০ যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা, যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠির স্বার্থানুকূলে হতেই হবে।..উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বন্টন

ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের"। আর এ বছর প্রাক-বাজেট প্রেস কনফারেন্সে (২৮ মে ২০১১) আমরা বলেছিলাম "সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য-দেশে একটি অর্থনৈতিকভাবে সচল, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাজেট একটি। সমাজ বিবর্তনের সব প্রক্রিয়ায় ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ বাঞ্চণীয়"।

ভূমিকাতেই কিছু সত্য স্বীকার করা জরুরী যে (১) অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্টরা এবার বাজেট প্রণয়নের আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বক্তব্য-মতামত-সুপারিশ বেশি মনোযোগের সাথে শুনেছেন, (২) এবারের বাজেটে আমাদের অনেক সুপারিশ গ্রহনও করা হয়েছে-এ জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রণালয় সর্ম্পকিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বাজেট প্রণয়ণ সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অর্ন্তভুক্তির জন্য আমরা কি সুপারিশ করেছিলাম

গত ২৮ মে ২০১১ প্রাক-বাজেট প্রেস কনফারেন্সে ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অর্ন্তভুক্তির জন্য আমাদের বিশ্লেষণ উদ্ভুত-সুপারিশসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতগুলো ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। সরকারি হিসাবে দারিদ্র্য ২০০৫ সালে যেখানে ৪০ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০১০ সালে এসে তা ৩১ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়ায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ ধরে রেখেছে। এ বছর প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৭ শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বছর প্রকৃত কৃষি মজুরি বেড়েছে। এটা কর্মসংস্থান বাড়ার ইঙ্গিত দেয়। সম্প্রতি রপ্তানি বেড়েছে। গত ছয় মাসে তা বৃদ্ধির পরিমাণ ৪১-৪২ শতাংশ। এর পাশাপাশি মূলধনি আমদানি বেড়েছে। চলতি বছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি আদায় করা গেছে। এগুলো ভালো দিক। এসমস্ত ইতিবাচক দিকগুলো বজায় রাখার জন্য বাজেটে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। গত কয়েক বছরে আয় যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি বেড়েছে বৈষম্য। কিছু মানুষের কাছে অর্থ গেছে, কিন্তু সবার কাছে ন্যায্যভাবে যায়নি। সামাজিক বৈষম্য কমানো সরকারের অঙ্গীকার। এ ক্ষেত্রে সরকার নিজের অঙ্গীকার পূরণে আরও উদ্যোগী হবে বলে আশা করি।

শতাংশ। এটা গ্রহণযোগ্য, এর বেশি হলেই সমস্যা। তবে বাজেট ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে।

৮। ঠিকমতো বাজেট বস্তবায়ন করার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য যতই ভালো হোক, বরাদ্দ যতই দেওয়া হোক বাস্তবায়িত না হলে সুফল পাওয়া যায় না। কাজেই বছরের শুরু থেকেই কার্যকর উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ চাই। সেই লক্ষ্যে কার্য্যকর কৌশল গ্রহণ/শক্তিশালী করার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

৯। সম্প্রতি ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া বেড়েছে। এর ফলে দুই ধরণের সমস্যা তৈরি হয়-একদিকে মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের অর্থ পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। সরকার যাতে পরিমিত পরিমাণে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেয়, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। বৈদেশিক সহায়তা অধিক পরিমাণে ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

১০। এবার রেমিট্যান্স কিছুটা বাড়লেও বাড়ার হার আগের থেকে অনেক কম। এবার ৪ শতাংশ বেড়েছে, গতবার ছিল ১৯ শতাংশ। রেমিট্যান্স যেন আরও বাড়ানো যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলির ওপর নজর রাখতে হবে এবং কয়েকটি দেশে নতুন গন্তব্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুখবর হলো, মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর ব্যাপারে সমস্যা মিটে গেছে এবং নতুন নতুন গন্তব্যে জনশক্তি পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দেখতে হবে যাতে জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো যায়। প্রতারক এজেন্সিগুলোর প্রতারণার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সত্যিকার অর্থে প্রবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে।

১১। পিপিপির সম্ভাবনা প্রচুর। তবে যেভাবে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে এখন পর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি বেশ কিছু প্রকল্প, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে, পি-পপির আওতায় গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রক্রিয়া আগামী বছর আরও জোরদার হবে এবং পিপিপির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হবে। পিপিপি-র নীতিমালার আওতায় ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে পিপিপি-সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের সংবিধানিক দায়-দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপানোর সামিল।

শতাংশ। এটা গ্রহণযোগ্য, এর বেশি হলেই সমস্যা। তবে বাজেট ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে।

৮। ঠিকমতো বাজেট বস্তবায়ন করার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য যতই ভালো হোক, বরাদ্দ যতই দেওয়া হোক বাস্তবায়িত না হলে সুফল পাওয়া যায় না। কাজেই বছরের শুরু থেকেই কার্যকর উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ চাই। সেই লক্ষ্যে কার্য্যকর কৌশল গ্রহণ/শক্তিশালী করার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

৯। সম্প্রতি ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া বেড়েছে। এর ফলে দুই ধরণের সমস্যা তৈরি হয়-একদিকে মূল্যস্ফীতির ওপর প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের অর্থ পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। সরকার যাতে পরিমিত পরিমাণে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেয়, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। বৈদেশিক সহায়তা অধিক পরিমাণে ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

১০। এবার রেমিট্যান্স কিছুটা বাড়লেও বাড়ার হার আগের থেকে অনেক কম। এবার ৪ শতাংশ বেড়েছে, গতবার ছিল ১৯ শতাংশ। রেমিট্যান্স যেন আরও বাড়ানো যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলির ওপর নজর রাখতে হবে এবং কয়েকটি দেশে নতুন গন্তব্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুখবর হলো, মালয়েশিয়ায় লোক পাঠানোর ব্যাপারে সমস্যা মিটে গেছে এবং নতুন নতুন গন্তব্যে জনশক্তি পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দেখতে হবে যাতে জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো যায়। প্রতারক এজেন্সিগুলোর প্রতারণার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সত্যিকার অর্থে প্রবাসীদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে।

১১। পিপিপির সম্ভাবনা প্রচুর। তবে যেভাবে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে এখন পর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি বেশ কিছু প্রকল্প, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে, পি-পপির আওতায় গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায়, এই প্রক্রিয়া আগামী বছর আরও জোরদার হবে এবং পিপিপির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হবে। পিপিপি-র নীতিমালার আওতায় ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সেই সাথে পিপিপি-সতর্কতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সরকারি দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর চাপিয়ে না দেয়া হয়। সেটা হবে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের সংবিধানিক দায়-দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপানোর সামিল।

১২। আগামী অর্থবছরের (২০১১-২০১২) বাজেটে করের আওতা বাড়ানো উচিৎ। একই সাথে সংগ্রহের পদ্ধতিও সহজ করা উচিৎ। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়ানো উচিৎ। মহিলা ও প্রবীনদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা সাধারণ ব্যক্তি করদাতাদের আয়ের সীমা থেকে বেশী হওয়া প্রয়োজন।

১৩। কর অবকাশের মেয়াদ এ অর্থবছরে শেষ হবে। বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতে কর অবকাশ আরও ১/২ অর্থবছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

১৪। শতভাগ বাজেট বাস্তড়বায়ন-সরকারের এ অঙ্গীকার গত দুই অর্থ-বছরে সরকার রক্ষা করতে পারেনি। বাংলাদেশ অর্থনীত সমিতি সরকারের সম্প্রসারণমূলক বাজেট আকারকে উচ্চভিলাষী মনে করে না, বরঞ্চ বাজেট বাস্তবায়ন (implementation) কাঠামোকে দুর্বল মনে করে। ইতিমধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় কিছু গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও অনেক বেশী জোরদার করতে হবে। বাজেট প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কিভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth) লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সম্পৃক্ততা অবশ্যই প্রয়োজন।

১৫। সরকারি ব্যয় কমানোর সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। এ প্রসংগে জনপ্রশাসন সংস্কার-এর অংগীকার বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। একাজটি গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নেয়া জরুরি। বাজেটে এর প্রতিফলন থাকা উচিত।

১৬। কর আয় বাড়ানোর জন্য এনবিআর-এর মানব ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর প্রশাসনের সততা নিশ্চিত করা, কর পরিধি বৃদ্ধি, অন-লাইন কর প্রদান ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, বিলাসদ্রব্যের উপর করারোপ বা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৭। সকল বিত্তবান/স্বচ্ছল ব্যক্তিকে আয়করের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যের আলোকে জরিপ চালাতে হবে। এবং তথ্য ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেককে টিআইএন দিতে হবে। কর প্রশাসনকে উপজেলা এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে।

১৮। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রাক-বাজেট পর্যালোচনায় সরকারের কাছে কর ও অন্যান্য সুবিধা দাবী করে থাকে।

এবছরও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিচারে এ সমস্ত যুক্তি বা দাবী যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।

১৯।আমাদের দেশে cost of doing business কমানোর লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং এর ফলাফল কি এ–সম্পর্কে বাজেটে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

২০। পূর্বের ন্যায় বর্তমান অর্থবছরেও সঞ্চয় হার বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি। এ ভারসাম্যহীনতার কারণে সঞ্চয়ের বেশ বড় অংশ speculative market-(যথা রিয়েল স্টেট, সেকেন্ডারী পুঁজি বাজার, স্বর্ণ ক্রয়)-এ যাবার প্রবণতা বেড়েছে। সুতরাং সঞ্চয়কে অধিকহারে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নেবার সুস্পষ্ট কার্যকর পদক্ষেপ থাকতে হবে।

২১। স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে এবং রাজধানী ও শহরাঞ্চলের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে "অর্থনৈতিক অঞ্চল" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পারে। এ পদক্ষেপ দেশে সামাজিক ও ভৌগলিক বৈষম্য ঘুচাতে সহায়ক হবে।

২২। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; বিশেষ করে শিল্প পার্ক গড়ে তোলা দরকার। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।

২৩। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি পূর্বের ন্যায় এবারও বলছে, বাজেটে কালো টাকার বা অপ্রর্দশিত টাকা সাদা করার সুযোগ থাকা উচিৎ নয়। এ ধরণের সুযোগ একদিকে সৎ করদাতাদের কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করে এবং অন্যদিকে দুর্নীতিকে উৎসাহিত ও সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। বিগত বছরগুলোতে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ কোন লক্ষণীয় সুবিধা অর্থনীতির জন্য বয়ে আনেনি। একইভাবে বিও একাউন্টধারীদের টিন থাকা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ।

২৪। আমাদের উন্নয়ন বাজেটে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতি খাত। বর্তমান বাজেট কাঠামো ও বরাদ্দবিন্যাসে তা প্রতিফলিত হয়। বিনিয়োগ বাড়ানো, ভর্তুকিসহ অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি গ্রামীনকৃষি বহির্ভুত খাতগুলোর উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। কিছু

কিছু সরকারী কর্মসূচী যেমনঃ একটি বাড়ী-একটি খামার, কর্মসৃজন ইত্যাদির বিপুল সম্ভাবনা আছে। তবে এর বাস্তবায়ন গতি বাড়াতে হবে।

২৫। দারিদ্র-পীড়িত এলাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলাকায় সরকারি ভর্তূকী বিশেষ করে কৃষি উপকরণ বিতরণে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ ও দারিদ্র-পীড়িত কৃষকদের স্বল্পসুদে বা সুদবিহীন ঋণ প্রদানেরও ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

২৬। গতবারের ন্যায় এবারও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শষ্য-বহুমুখীকরণের দরকার। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য "কৃষি বীমা" চালুর সরকারী অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৭। কৃষি জমির বাণিজ্যিক ব্যবহার যা খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে বিশেষতঃ তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার প্রয়াস বাজেটে থাকতে হবে। কৃষি বিপনন ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য। গত বছরের সরকারি অঙ্গীকার–"কৃষক বিপনন দল" ও "কৃষক ক্লাব" স্থাপন সম্পর্কে আমরা জানতে আগ্রহী।

২৮। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পর আমাদের বিবেচনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে আমরা জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করি। এ সরকারের অন্যতম অর্জন নূতন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলে অর্থ-বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে বাড়াতে হবে।

২৯। গ্রামীন স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগে তেমন কোন অগ্রগতি নেই। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্চনীয়।

৩০। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি কর্মসূচীসমূহ দরিদ্র জনগোষ্টীকে নিরাপত্তা প্রদানসহ তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করে। এ লক্ষ্যে অনেক কর্মসূচী রয়েছে-এগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে এবং এগুলো যাতে সঠিকভাবে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আগামী অর্থবছরে (২০১১-১২) সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি কর্মসূচীর আওতা বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ এমূহুর্তে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি সুবিধা পাবার যোগ্য ৩ কোটি ২০ লক্ষ খানার মধ্যে মাত্র ৭৮ লক্ষ খানা অর্থাৎ ২৫ ভাগ খানা এ সুবিধা পেয়ে থাকে।

৩১। অর্থবছর ২০১০-১১ বাজেটে প্রথম ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে সারা দেশে

৩৪,৩৫২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫,৫৩৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। অগ্রগতির চিত্র ব্যাখ্যাসহ আগামী বাজেটে এক্ষেত্রে অগ্রগতি তরান্বিত করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

৩২। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলা আছে। অন্য দিকে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সুতরাং দারিদ্র নিরসন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে অধিক হারে খাস জমি বন্দোবস্ত করতে পারে। এ কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল।

৩৩। জনস্বাস্থ্য গবেষকরা জানান, সরকারের উদার করনীতির জন্য বাংলাদেশে তামাক সেবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সিগারেটের ক্ষেত্রে মোট ৪টি সম্পূরক কর স্ল্যাব আছে। এ স্ল্যাবসমূহের কর উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো উচিৎ। এর ফলে সরকারি রাজস্ব বাড়বে এবং অন্যদিকে সিগারেট সেবীর সংখ্যাও কমে যাবে।

৩৪। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও ব্যাপকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। সেজন্যে পরিবেশ বান্ধব বাজেটের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গত দুটি অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার পায় নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া আরও কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ যেমন চিংড়ীচাষ জনিত পরিবেশ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার উপায় বের করা, পানি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি বাস্তবায়নে বাস্তব পরিকল্পনা বা আর্থিক বরাদ্দ থাকা বাঞ্চনীয়।

৩৫। গত দুইটি বাজেটেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন, দক্ষিণাঞ্চলের জলবদ্ধতা নিরসন, সেচ সম্প্রসারণ ও হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ না হলেও কিছু বরাদ্দ ছিল। এসমস্ত কর্মসূচীর অগ্রগতি জানানোসহ ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৩৬। হাতিরঝিল প্রকল্পের বাস্তবায়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি), হাজারীবাগ ট্যানারী স্থানান্তর, এসমস্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি জানা প্রয়োজন।

৩৭। ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবারাহের কর্মসূচি যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে সনোফিল্টারের সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

৩৮। বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় চলতি অর্থবছরে বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু এখাতে বরাদ্দ ছিল অল্প, তাছাড়া বনায়ন কর্মসূচীর বড় প্রতিন্ধকতা হলো দুর্নীতি ও বন ধ্বংসের বেআইনি কার্যকলাপ।

৩৯। পরিবেশবান্ধব বাজেট বাস্তবায়নের জন্য শুধু অর্থমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও আর্থিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ন ও সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কার্যকলাপ প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

৪০। বর্তমান অর্থবছরে (২০১০-১১) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতকে রাষ্ট্রীয় জরুরী খাত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সরকার স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলেছিল। সরকার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদকের মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বর্তমানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম ও সিস্টেম লস কমানো ইত্যাদি পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। এত কিছু করার পরও এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতিই আমাদের দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সেজন্য আগামী অর্থবছরেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানীখাত সবিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। স্বল্প মেয়াদে রেন্টাল ও কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সমর্থনযোগ্য হলেও মধ্যম ও বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রতি নজর দেয়া উচিৎ। তাছাড়া, এয়ার কন্ডিশন আমদানীর ক্ষেত্রে করারোপ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নিজস্ব জ্বালানি ব্যবস্থা ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৪১। বর্তমান অর্থবছরের বাজেট জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ এর আওতায় সরকার বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। তাছাড়া, তথ্য প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্যও যথেষ্ঠ

বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে। এ ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি খাতকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ খাতের কর অবকাশ (যা বর্তমান বছরের ৩০শে জুন সমাপ্ত হবে) আরও ৫ বছর বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধিকল্পে বর্তমান ১৫ শতাংশ ভ্যাটও কমানোর প্রয়োজন।

৪২। সরকারের বাজেট বাস্তবায়নের ও সরকারী ব্যয় অর্থায়নে আর্থিক খাতের বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমান অর্থবছরে পুঁজি বাজারের উত্থান ও তৎপরতীতে পতন শুধুমাত্র সচেতন দেশবাসীর দৃষ্টিই আকর্ষন করেনি সাথে সাথে অসংখ্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে নিঃস্ব ও সম্বলহীন করে দিয়েছে। পুঁজি বাজার সংস্কারের জন্য সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের অনতিবিলম্বে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। পুঁজিবাজারের পতন বাজার নিয়ন্ত্রণকারীদের স্বাধীনতার বিষয়টি যৌক্তিকভাবেই সামনে নিয়ে আসে। তাছাড়া, পুঁজিবাজার ও অর্থ-বাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ।

৪৩। সরকারী পর্যায়ে ও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আর্থিক শৃংখলা আনয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর স্বাধীনতার বিষয়টিও অপরিহার্য। তার অর্থ এই নয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাজস্বনীতিকে অবজ্ঞা করবে। গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ পরিচালিত বিভিন্ন সংস্কারের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গৃহীত বর্তমান নীতিমালাসমূহ যেমনঃ অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন, কৃষি ও বর্গাচাষী অর্থায়ন, সবুজ অর্থায়ন, ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে এবং আনবে।

৪৪। যোগাযোগ খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে; তবে রেলপথ ও নৌপথের তেমন উন্নয়ন হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমন্বিত উন্নয়ন-এর লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে একটি Integrated Multimodal Transport Policy প্রণয়নের অঙ্গীকার ছিল। সেটার অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ জরুরী।

৪৫। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত সরকারের লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা। এজন্য নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার নারী উন্নয়ন নীতিও ঘোষণা করেছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের প্রায় ২৫.৯ শতাংশ ব্যয় করার কথা ছিল জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকল্পে। এর অগ্রগতি জানা প্রয়োজন।

৪৬। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য লাভজনকভাবে বাজারজাত করার জন্য বেসরকারী উদ্যোগে একটি স্থায়ী বিপনন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য কর উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

৪৭। নারীর সাংসারিক কাজের ফলে যে মূল্য সংযোজন হয়, তার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দানের উদ্যোগটি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে টেকসই অর্থনীতির স্বার্থে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এ কাজে অগ্রসর হয়েছে। নারীর অস্বীকৃত কাজের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নারীকে সমাজে সম্মানিত করবে এবং ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতনের মত কঠিন সমস্যাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃত হবে।

৪৮। আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম প্রণেতা ও লেখকদের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। এ শিক্ষার কর্মসংস্থান নেই। গত বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করতে বলা হয়েছে। এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

আমাদের প্রস্তাব এবং সরকারের বাজেট ঘোষণার মধ্যে দুরত্ব কম। বাজেটের তাত্ত্বিক দিক, উদ্দেশ্য, বরাদ্দ ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারী ঘোষণা মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাজেটের বিশেষ করে এডিপি বাস্তবায়ন হার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারী প্রস্তাবনাসমূহ, পিপিপি বাস্তবায়নযোগ্য করার নিমিত্তে নীতিমালা প্রণয়ন, জেলাওয়ারী বাজেট প্রণয়নে বাধাসমূহ দূরীকরণ, জেন্ডার সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে সরকারী পদক্ষেপসমূহ, সম্প্রসারনশীল বাজেট আকার, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম, খাস-জমি বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবনাসমূহকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তার অর্থ এই নয় যে, বাজেটের কোন দুর্বলতা বা downside ঝুঁকি নেই। চুড়ান্ত বাজেট প্রণয়নে সেগুলো অবশ্যই বিবেচনায় এনে কার্যকর আরও কিছু পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত করে বাজেটকে এর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাজেটের অনুমান ভিত্তি

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তঃস্থ কয়েকটি অনুমানকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। ভিত্তিগুলো নিম্নরূপঃ মন্দা

থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাড়াচ্ছে এবং বিশ্ব বাণিজ্যের গতি ফিরে আসছে; কৃষি খাতের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে; রপ্তানি বাণিজ্যে অবস্থান সুদৃঢ় হবে; অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার সক্ষমতা থাকবে; আগামী অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৭ শতাংশ; রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে; PPPসহ বিভিন্নভাবে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বাড়বে; কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে; বিদ্যুৎ-জ্বালানি-যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নতি হবে; মেয়াদি শিল্প ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে; ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশ পৌঁছবে; রাজস্ব আহরণ জিডিপির ১৩.২ শতাংশে উন্নিত হবে; একই সময়ে এডিপি-র বরাদ্দ জিডিপি-র ৭.১ শতাংশে উন্নীত হবে; বিনিয়োগ হার জিডিপির ২৪.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২ শতাংশ পৌঁছবে; মূল্যস্ফীতি আগামী অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে উপনিত হবে (এবং ক্রমান্বয়ে মধ্যমেয়াদে তা কমে ৫ শতাংশে দাঁড়াবে); বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা হবে; অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেক গুরুর মতে প্রক্ষেপনের অনুমান ভিত্তি অনেক সময় কাজ করে না। যে কারণে বলা হয় "অর্থনীতিবিদদের কাজ হলো গত কাল অনুমানের ভিত্তিতে যে প্রক্ষেপন করা হয়েছিলো তা কেন আজ কাজ করলো না সে বিষয়ে ভবিষ্যতে বিচার-বিশ্লেষণ করা" এসব কথা সত্য হতে পারে যখন প্রক্ষেপণের অনুমান ভিত্তি হয় বাস্তবতা বিবর্জিত। বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ও দুর্বল দিকসমূহসহ অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ বিভিন্ন সমীকরণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব যে সঞ্চয় হার যখন ক্রমবর্দ্ধমান (এমন কি বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি), যখন বিনিয়োগ স্থবিরতা দূর হবার লক্ষণসমূহ স্পষ্ট, যখন রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্দ্ধমান, যখন রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ার লক্ষণ স্পষ্ট, যখন কৃষির গতি বাড়ছে, যখন মেয়াদি শিল্প ঋণ বাড়ছে, যখন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, যখন বিনিয়োগে সম্ভাব্য "ভীতি ফ্যাক্টর" কমছে এবং সেইসাথে যখন বাড়ছে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও সুরক্ষার উপাদান–এ অবস্থায় বাজেটের অনুমান ভিত্তিসমূহ আমাদের মতে কাঙ্খিত মাত্রায় যুক্তিসংগত এবং বাস্তবসম্মত।

বাজেটের আয় ও ব্যয় – আমাদের বিশ্লেষণ

এ বছর বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৮৯কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৮.২%) যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ২৫.৮ শতাংশ বেশি। যেখানে অনুন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট খাতের মোট বরাদ্দ ১লক্ষ ১৭ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৩.১%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ ৪৬ হাজার কোটি

টাকা (জিডিপি-র ৫.১%)। বাজেটের আকারের সাধারণ গতিধারা এবং মূল্যস্ফীতির নিরিখে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ যেমন একদিকে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হবে তেমনি অনুন্নয়ন খাতের ১৫ শতাংশ আসলে দারিদ্র দূরীকরণ উদ্দিষ্ট উন্নয়ন ব্যয় (প্রধানত অতি দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচীর ব্যয়)। এ বছর বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক, কারণ নূতন বেতন কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে, সুদ পরিশোধ ব্যয় বাড়বে, কৃষি ভতুর্কিসহ ভাড়া ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভতুর্কি দিতে হবে, সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাড়ার কারণে বর্দ্ধিত সুদ পরিশোধ করতে হবে।

এ বছর বাজেটে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.২%)। এ আয়ের ৯৫ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৬%) আসবে কর-রাজস্ব হিসেবে (এনবিআর কর রাজস্ব ৯১,৮৭০ কোটি টাকা), আর কর-বহির্ভুত খাত থেকে রাজস্ব আয় হবে ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.৬%)। অর্থাৎ রাজস্ব আয়ের ৮১ শতাংশ আসবে কর রাজস্ব থেকে।

আমাদের বাজেট–একটি ঘাটতি বাজেট। মোট প্রাক্কলিত ঘাটতির পরিমান ৪৫ হাজার ২০৪ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৫%)। লক্ষ্যণীয় যে আমাদের বাজেট ঘাটতির পরিমানটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দের প্রায় সমান। ঘাটতি পূরণে সহজ শর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক ঋণ থেকে আহরণ করা হবে ১৭ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ২৭ হাজার ২০৮ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৩%)। অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি পূরণে ৬০ শতাংশ নির্ভর করতে হবে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া হবে ১৮ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.১%) এবং ব্যাংক বহির্ভুত খাত থেকে নেয়া হবে ৮ হাজার ২৫১ কোটি টাকা (জিডিপি-র ০.৯% যার বেশির ভাগ আসবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে)। এ ক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো ঘাটতি বাজেটের সাথে মূল্যস্ফীতি তেমন সম্পর্কিত নাও হতে পারে যদি ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে উৎপাদনশীল খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। এ দিকে নজর রাখতে হবে।

বাজেট জনকল্যাণকামী এবং ভারসাম্যপূর্ণ কি'না–এ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি-র) বরাদ্দ বিন্যাস এবং মোট বাজেটের (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। আমরা আগেই বলেছি বাজেটকে হতে হবে উন্নয়নের দিক-নির্দেশক দলিল।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ বিন্যাসে প্রধান খাত হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ **মানবসম্পদ উন্নয়ন খাত** যেখানে বরাদ্দ ২২.২ শতাংশ (১০,৩০৪ কোটি টাকা)। আমরা মনে করি মানবসম্পদ উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির এ বরাদ্দ-অগ্রাধিকার যুক্তিযুক্ত, কারণ ব্যপক জনসংখ্যার এ দেশে যখন ধীরে ধীরে জনমিতিক উত্তরণ ঘটছে তখন উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদে জনমিতিক লভ্যাংশ (demographic dividend) সর্বোচকরণের বিকল্প নেই। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামোতে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে সার্বিক **কৃষি খাতকে** (১৮.৫% বরাদ্দ) যার মধ্যে আছে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পানি সম্পদ। এ অগ্রাধিকারও যুক্তিযুক্ত কারণ দেশের ৭৫ শতাংশ মানুষের বাস পল্লী অঞ্চলে। বরাদ্দ তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে **বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত** যে খাতে বরাদ্দ ১৮ শতাংশ। যেখানে বিদ্যুত-জ্বালানি স্বল্প প্রাপ্তির কারণে জনভোগান্তি বেড়েছে এবং শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে গতি হ্রাস পাচ্ছে এবং একই সাথে যেখানে নির্বাচনী ইশতেহারে তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিদ্যুৎ-জ্বালানির কথা বলা হয়েছে সেখানে এ অগ্রাধিকার যুক্তিযুক্ত এবং প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরপরেই চতুর্থ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১৭ শতাংশ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো **যোগাযোগ** (সড়ক, রেল, সেতু, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ)। আমরা মনে করি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামোয় বৃহৎ খাত ওয়ারি যে বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে তা যেন পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন না হয়- সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন নিয়ে যে মোট বাজেট তার ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিম্নরূপ। প্রস্তাবিত বাজেটে সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোতে সর্বোর্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে **সামাজিক অবকাঠামো খাতে** যার অন্তভুক্ত মানব সম্পদের বিভিন্ন উপখাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য। সামাজিক অবকাঠামো খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৯ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩০.৪ শতাংশ। যে যুক্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে সর্বোর্চ বরাদ্দ যুক্তিযুক্ত ঠিক একই যুক্তিতে সামাজিক অবকাঠামো খাতের এ বরাদ্দ সুচিন্তিত। বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোতে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হলো **ভৌত অবকাঠামো খাত** যেখানে বরাদ্দ প্রস্তাব মোট বরাদ্দের ২৯.২ শতাংশ। এ খাতের মধ্যে আছে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত (১৫.২%), বৃহত্তর যোগাযোগ খাত (৬.৫%), বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত (৫.১%)। ভৌত অবকাঠামোর এ অগ্রাধিকার যুক্তিসঙ্গত। সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোতে তৃতীয় প্রধান খাত হলো **সাধারণ সেবা খাত** যেখানে প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ১৭.১ শতাংশ। এর পরেই আছে **সুদ পরিশোধ** (মোট বরাদ্দের ১১%)। আর তারপরেই আছে **নীট ঋণদান ও অন্যান্য** ব্যয় (৭.৮%) এবং **পিপিপি, ভর্তুকি ও দায়** (৫%)। উল্লেখ্য যে সুদ পরিশোধ খাতের ব্যয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের

ব্যয়ের চেয়ে দ্বিগুন বেশি–বিষয়টি যথেষ্ট চিন্তা উদ্রেগকরী-উদ্বেগজনক এবং অতীতের পুঞ্জিভূত ভারসাম্যহীনতার ফল।

প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামোর যে বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করছি তাতে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে এ কাঠামো 'রূপকল্প ২০২১' বিনির্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই আমরা মনে করি মোট বাজেটের যে কাঠামো-বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে তা যেন পরিবর্তিত না হয় এবং একই সাথে তা যেন পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়-এ দিকে সব্বোর্চ সমন্বিত নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খাতওয়ারী ব্যয়-বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ

প্রস্তাবিত ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে "কতিপয় প্রধান খাত" এবং "জনকল্যাণ ও সুশাসন" শীর্ষক উপস্থাপনায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রধান খাতভিত্তিক কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও বরাদ্দ বিষয়সমূহ তুলে ধরেছেন, যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নরূপঃ

১. গত অর্থবছরের ন্যায় ২০১১-১২ অর্থবছরের বেলায় "কতিপয় প্রধান খাত" শিরোনামের প্রথম ও প্রধান খাত হিসেবে আনা হয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত। বর্তমান সরকারের বর্তমান মেয়াদে বিদ্যুৎ সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার প্রতিশ্রুতি পুর্ণব্যক্ত করে "বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কিত মহাপরিকল্পনার" আওতায় বর্তমান সরকার গত অর্থবছরে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং বর্তমান অর্থবছরে আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা বর্ননা করা হয়। ২০১৩ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৭৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক, ডুয়েল ফুয়েলভিত্তিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইকল্পে প্রাক-সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকল্প জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেশী হবে বিধায় ভর্তুকি প্রদান ও বিক্রয়মূল্য পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এগুলো ছাড়াও, গত অর্থবছরের ন্যায় বর্তমান অর্থবছরেও সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য যথেষ্ঠ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাতে মোট ৮হাজার ৩১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করে, যা গতবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশী।

২. গত বছরের ন্যায় এ বছরের বাজেটেও কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন নিয়ে সরকারের সমন্বিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। এ প্রসংগে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "গ্রামীণ অকৃষি খাত, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন, গ্রামীণ আবাসন ও স্যানিটেশন, ভূমি ও পানি সম্পদের ব্যবহার এবং গ্রামঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশকে আমরা বরাবরই কৃষির সংগে এক করে দেখছি"। ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন সরকারের লক্ষ্য। যুক্তিসংগত মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রদান (উন্নয়ন বিনিয়োগ) অব্যাহত রাখবে। আগামী অর্থবছরের (২০১১-১২) বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৪,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ৫,৭০০ কোটি টাকা। তাছাড়া কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণে ও কৃষি ঋণ বিতরণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সারাদেশে ইতোমধ্যে ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষক যাতে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সে লক্ষ্যে (গত অর্থবছরের অঙ্গীকার অনুযায়ী) ইতোমধ্যে ৪৯০টি কৃষক বিপনন দল এবং ১৬,৬৭৭টি কৃষক ক্লাব গঠন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরো ৬০০টি কৃষক বিপনন দল, ৬২০০টি কৃষক ক্লাব এবং ৪টি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে প্রনীত জাতীয় কৃষিনীতি সংশোধন করে জাতীয় কৃষিনীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হচ্ছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭,৪১১ কোটি টাকা।

৩. শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, নগরবাসীর দৈনিক পানির চাহিদা (দৈনিক ২৪৪ কোটি লিটার রাজধানীর পানি চাহিদা) পূরণ, ভূর্গভস্থ উৎসের উপর পানির নির্ভরতা কমানো, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ আবাসন সমস্যা দূরীকরন ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ১১,৭১৪ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশী।

৪. বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দেশের হত দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "জাতীয় খাদ্য নীতিমালা" যুগোপযোগী করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ভিজিএফ খাতে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন, কাবিখা খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ভিজিডি খাতে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনা-বেক্ষন কর্মসূচী খাতে ৪ লক্ষ ১০ হাজার মেট্রিক টন এবং খয়রাতী সাহায্য

খাতে ৮০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা (রেশন, OMS ইত্যাদি) চলমান থাকবে। খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য কর্ম সৃজন ও উৎপাদনে প্রণোদনা যোগান। উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ যাতে কর্মক্ষম প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে কর্মবিমুখ না করে সে দিকেও সরকার লক্ষ্য রাখবে।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সড়ক, রেল, নৌ ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হলে জনগণের যাতায়াত সহজতর হয়, পরিবহন ব্যয় হ্রাস পায়, ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসার ঘটে, কৃষিপণ্যের বিপনন সুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং সর্বোপরি তা দারিদ্র হ্রাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখে। যোগাযোগ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য সরকার অতি শীঘ্রই একটি সমন্বিত নীতিমালা Integrated Multi-modal Transport Policy চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়নমূলক কাজগুলোর মধ্যে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নকশা চূড়ান্ত হয়েছে, কুড়িল বিশ্বরোড এবং গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী উড়াল সড়ক (fly-over) নির্মানের কাজ এগিয়ে চলেছে। রেলওয়ের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র রেলপথ বিভাগ গঠিত হয়েছে, যার পরবর্তী ধাপে বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে (automation) বিভিন্ন সেবা প্রদান করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনালের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ বিভাগে, সেতু বিভাগ এবং রেলপথ বিভাগের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৯,৭৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং নৌ পরিবহন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৬৫৩ কোটি টাকা।

৫. সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া "রূপকল্প-২১" এ বর্নিত গতিশীল ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এপ্রেক্ষিতে ২০১১-১২ অর্থবছরে মানবসম্পদ খাতে সর্বমোট ৩৪,১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকল্পে প্রনীত হয়েছে শিক্ষানীতি-২০০৯ প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ইতোমধ্যে উন্নীত হয়েছে ৯৯.৩ শতাংশে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করার ক্ষেত্রে দক্ষিন এশিয়ার মধ্যে শ্রীলংকার পরেই বাংলাদেশের স্থান বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর একটি স্বচ্ছ নীতিমালার ভিত্তিতে ১৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে MPO ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা গুনগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গনিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষকের অভাব মোচনের জন্য সরকার সমন্বিত জরুরী পদক্ষেপ নিচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তৃনমূল পর্যায় থেকে

সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষনের জন্য সরকার আগামী অর্থবছরে একটি বিশেষ কার্যক্রম শুরু করবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক অগ্রগতি অর্জনের কারনে বাংলাদেশকে জাতিসংঘ UNMDG পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া তৃনমূল পার্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম সরকার পুনরায় শুরু করেছে। তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে টেলিমেডিসিন এবং বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি-র প্রসারকল্পে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে।

৭. সাধারণতঃ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বলতে অনেকেই সর্বত্র কম্পিউটার ব্যবহারকে মনে করলেও প্রকৃত অর্থে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির লাগসই প্রয়োগেরই একটি আধুনিক দর্শন। এ দর্শনের মূল বিষয় হচ্ছে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। ই-কমার্স চালুর জন্য লাইসেন্সিং গাইডলাইন এবং ই-গর্ভন্যান্স চালুর লক্ষ্যে সকল সরকারী দপ্তরকে আইটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল-এর সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল উপজেলাকে মোবাইল ইন্টারনেট-এর আওতায় আনা হয়েছে।

৮. ২০১১ সাল নাগাদ দেশে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তোলার জন্য, যেখানে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশ এবং এখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি ২৫ শতাংশ উন্নীত হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০ প্রনীত হয়েছে। শিল্পনীতির আওতায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের শিল্পখাতের নিয়ামক হবে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল বেসরকারী খাত, সেজন্য এ খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক ও তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে। দেশের পাট খাতকে চাংগা করতে BJMC-র সকল দায়দেনা সরকার গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সরকার বাংলাদেশ "অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০" প্রণয়ন করেছে। এই আইনের আওতায় অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার মধ্যেমে একদিকে পশ্চাদপদ এলাকা ও অন্যদিকে শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকাকে শিল্পে বা কৃষিতে বিকশিত করা যাবে। শিল্পনীতির আওতায় সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিকের মাধ্যমে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে বানিজ্যের প্রসারে ব্যবসা করার ব্যয় (cost

of doing business) কমিয়ে আনা একান্ত দরকার। এলক্ষ্যে সরকার ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির আধুনিকায়ন, বানিজ্যিক বিরোধ নিরসন, স্বয়ংক্রিয় শুল্ক হিসাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্যাবলী যাতে একটি একক ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়, সেজন্যে একটি জাতীয় ট্রেড পোর্টাল স্থাপনের কার্যক্রম চালছে। রাষ্ট্রীয় বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান টিসিবি-কে শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে এর সামগ্রিক পুর্ণগঠন-এর কথা বলা হয়েছে।

৯. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং দুর্যোগ প্রশমনে সক্ষমতা অর্জনের জন্য সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। গত দুই বছরের এ ফান্ডে ১,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ফান্ডের অর্থায়নে বনায়ন, বৃক্ষরোপন, সৌরশক্তি ব্যবহার, বাঁধ নির্মান, ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ঘরবাড়ী নির্মান ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে আরও ৭০০ কোটি টাকা এ ফান্ডে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের অর্থায়নে ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

১০. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দারিদ্র নিরসনের একটি কার্যকর উপায়। এ নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ৪টি ভাগে বিন্যস্ত করে দারিদ্র নিরসনমূলক কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করে–

ক) বিশেষ ভাতা প্রদান;
খ. ক্ষুদ্র ঋণ;
গ. বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা;
ঘ. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ।

আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য অন্যান্য অনেক কর্মসূচীর মধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য দুঃস্থ ভাতা ও অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের জন্য সরকার যথাক্রমে ৮৯১ কোটি, ৩৩১ কোটি ও ১০৩ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছে।

চূড়ান্ত বাজেটের জন্য আমাদের সুপারিশ

১. বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মত এবং মানসম্মত বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন কার্যকারীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেটে ঘোষিত পদক্ষেপসমূহের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আন্তমন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয় জোরদার

এবং পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন কর্মকান্ড শক্তিশালী করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ করা জরুরী।

২. বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে সরকারকে অবশ্যই প্রচন্ড বেগ পেতে হবে। বাজেট ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ। অনুন্নয়ন মূলক খরচ কমানো, বিশেষ করে জনপ্রশাসনের ব্যয় কমানো, অপচয় কমানো ইত্যাদি সম্পর্কে বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। গত দুই বাজেটে সরকার জনপ্রশাসন সংস্কারের কথা বললেও এবার কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা উচিৎ।

৩. ব্যাংক-ব্যবস্থা থেকে বিপুল ঘাটতি অর্থায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের নিকট আরও একটি বড় বাঁধা। এক্ষেত্রে শুধু সংকোচন মূলক মুদ্রানীতি ও টিসিবি শক্তিশালী করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধ করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন যথোপযুক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা, বাজার তদারকী ও বাজার হস্তক্ষেপ-বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট করা উচিৎ।

৪. বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি অন্যতম পথ "cost of doing business" কমিয়ে আনা। গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বিষয়টিকে "খুবই দুশ্চিন্তার" বিষয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিগত এক বছরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন উন্নতি হয় নি। এ বিষয়ে চুড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট উল্লেখসহ বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ বিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ হলো: আইন শৃংখলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল", বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধে সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসহ দলিল-দস্তাবেজ সহজীকরণ, ব্যবসা-দ্রুতায়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ ইত্যাদি।

৫. পুজিঁবাজার সংস্কার ও পুজিঁবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বর্তমান সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ মূহূর্তে পুজিঁবাজারের সমস্যা শুধু সরববাহ ঘাটতি নয়। চাহিদা স্বল্পতাই বরং প্রকট আকার ধারণ করেছে। বাজেটে ঘোষিত পদক্ষেপ সমূহ যেমন BO একাউন্টধারীদের TIN নম্বর ঘোষনা না দেওয়া, capital gain tax আরোপ না করার পাশাপাশি ব্রোকার হাউজগুলির উৎসে কর র্কতন না করা, প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিজস্ব র্পোটফেলিও তৈরীর ব্যাপারে রাজস্ব ও রেগুলেটরী প্রনোদনা প্রদান করা যেতে পারে। সর্বোপরি, পুজিঁবাজার সংস্কারের জন্য সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী

অনতিবিলম্বে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। তাছাড়া, পুজিঁবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে সরকারী ও কর্পোরেট বন্ড মার্কেট develop করা উচিৎ। এর ফলে একদিকে stock market এর উপর নির্ভরশীলতা কমবে অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্রকরনে সক্ষম হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কারীদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে Mutual Fund এর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন। বিষয়সমূহ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ জরুরী।

৬. বাংলাদেশের অর্থিক ব্যবস্থা মূলত: ব্যাংক নির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেট-এর সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি "ব্যক্তি খাত"-এর অর্থায়ন যাতে কোন অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন না হয়, তার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে pro-active ভূমিকা নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর মুদ্রানীতি ও ঋণনীতি হতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋন প্রবাহ রোধকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক বানিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

৭. বাজেটে সকল রপ্তানীকারকদের রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার ০.৪০-০.৫০% এর পরিবর্তে ১.৫% এ নির্দ্ধারণ-এর প্রস্তাব করা হয়েছে (পৃ:১৫৬)। রপ্তানির ক্ষেত্রে আয়কর সংগ্রহ হারের এ উন্নয়ন রপ্তানি অনুৎসাহিত করবে অথবা রপ্তানিকারকদের অসৎ পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করতে পারে। বিষয়টি বাণিজ্যের ভারসাম্যের সাথেও জড়িত। আমরা মনে করি রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার প্রস্তাবিত ১.৫% এর পরির্বতে ০.৬০%-০.৭০%-এ নির্দ্ধারণ যৌক্তিক হবে।

৮. বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে "কৃষি ও কৃষক মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ভাবনার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ" (পৃ:২)। কিন্তু এবারের বাজেটে গত অর্থবছরের তুলনায় কৃষি ভর্তুকি কমেছে ১,২০০ কোটি টাকা (৫,৭০০ কোটি টাকা থেকে কমে ৪,৫০০ কোটি টাকা; পৃ:২৯)। সেইসাথে এবারের বাজেটে ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্থ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে–যা গত বছরের বাজেটের চেয়ে কম (পৃ:১১৯)। আমরা মনে করি চুড়ান্ত বাজেটে হয় কৃষি ভর্তুকি আগের তুলনায় বাড়াতে হবে অথবা কেন কৃষি ভর্তুকি ১,২০০ কোটি টাকা কমলো তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। সেই সাথে আমরা এও মনে করি যে কৃষি ও কৃষক ভাব-

নার যর্থাথতা বিচারে ৪০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার একর কৃষি জমি বন্দোবস্থদেয়া সম্ভব; আর পাশাপাশি ২০ হাজার জলাহীন মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার একর খাস জলাশয় বন্দোবস্থ দেয়া সম্ভব। বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেয়া সমিচিন হবে।

৯. যদিও নির্বাচনী ইশতেহারে 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো-বাজেটে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। আমরা মনে করি চুড়ান্ত বাজেটে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ স্থির করা প্রয়োজন।

১০. এবারের বাজেটে মধ্যবিত্তের আবাসনসহ দরিদ্র মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসনে গৃহায়ণ তহবিলের কথা উল্লেখ আছে (পৃ:১১৯-১২০)। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আবাসন খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা মনে করি দরিদ্র ও নিবিত্ত মানুষের আবাসনের বরাদ্দ পৃথক দেখানো এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

১১. আমরা বলেছি এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সুবিধা পাবার যোগ্য খানার সংখ্যা ৩ কোটি ২০ লাখ যাদের ৭৫ শতাংশ এ সুবিধে বঞ্চিত। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এ খাতটি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সামগ্রিক বিচারে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ এবং পরিধি (coverage) হ্রাস পেয়েছে। আমরা মনে করি জনকল্যাণ নিশ্চিত ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত বাজেটে এ খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) প্রস্তাবিত বরাদ্দ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা জরুরী। সেইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সুবিধা প্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (যেমন বয়স্কভাতা যারা পান তারা দুরবর্তী গ্রাম থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে এসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন)।

১২. ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য "শস্য বীমা" "কৃষি বীমা", "জীবিকা বীমা", "প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা" ইত্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথ নির্দেশসহ ব্যয়-বরাদ্দ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

১৩. দারিদ্র-পীড়িত ভৌগলিক এলাকা (চর-হাওর-বাওর-মঙ্গা)এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ (আইলা-সিডর-সাইক্লোন) এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদবিহীন স্বল্পমেয়াদি (৬মাস) ঋণ প্রদান দারিদ্র দূরীকরণে অন্যতম পন্থা হিসেবে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়টি এবারের চুড়ান্ত বাজেটে বিবেচিত হতে পারে; সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৪. এবারের বাজেটে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ:১১৯)। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আর্থিক বরাদ্দের উল্লেখ নেই। আমরা মনে করি চূড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা জরুরী।

১৫. বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে কর্মক্ষম ৫ কোটি ৬২ লক্ষ জনশক্তির মধ্যে বেকার জনগোষ্ঠির সংখ্যা মাত্র ২৫ লক্ষ (পৃ:৯৪), অর্থাৎ বাংলাদেশে বেকারত্বের হার মাত্র ৪.৪ শতাংশ। এ তথ্য সঠিক হলে কর্মসৃজন-কর্মসংস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকার কথা নয়। আমরা মনে করি হয় এ তথ্য ভুল অথবা বেকারের সংজ্ঞায় কোন বিভ্রান্তি আছে। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় চূড়ান্ত বাজেটে নিস্পত্তি হওয়া জরুরী।

১৬. নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেইসাথে শিক্ষার স্তর ভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল ইত্যাদি এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্ন দেখানো উচিত।

১৭. বিগত দুই অর্থবছরসহ বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। পরিবেশ বান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্টির পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কর্মকান্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অংঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী।

আমাদের শেষ কথা

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ করার স্বপ্ন দেখছি। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ, আর এ কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দেবেন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকেরা। এ বিনির্মান এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে এ বিনির্মাণের পথ-কৌশল। এ নিরিখে এ বছরের বাজেটে বেশ কিছু সাহসী এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ রয়েছে। একারণেই এ বছরের বাজেট আশা সঞ্চারণকারী দলিল। এবারের বাজেট অনেক দূর পর্যন্ত "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত" দলিল। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে। 'রূপকল্প ২০২১' যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যা-ই বলা হোক না

কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এ বিশ্বাস অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানবিক যে কোনো মানদণ্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ সরকারের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে

ড. আবুল বারকাত

সভাপতি

ও

ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী

সাধারণ সম্পাদক,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

আয়োজিত

সাংবাদিক সম্মেলন

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯/ ১৪ জুন ২০১২

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তন, ৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

ফোন ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬

ভূমিকা

গত ৭ জুন ২০১২/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয় সংসদে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করলেন। এবারের বাজেট দলিলের শিরোণাম **"তিনটি বছরের খতিয়ান: আগামীর পথ রচনা বাজেট বক্তৃতা ২০১২-২০১৩"**। দশটি অধ্যায়ে বিভাজিত ৩০৫ পয়েন্ট সম্বলিত বাজেট বক্তৃতার শুরু ও শেষ হয়েছে মহাজোটের দিনবদলের সনদ "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের আকাঙ্খা নিয়ে। যে আকাঙ্খার পক্ষে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারকে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গণতান্ত্রিক রায় দিয়েছে। 'রূপকল্প ২০২১'-এর মূল কথা হল–মুক্তিযুদ্ধের সুর্বণ জয়ন্তী নাগাদ অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র; ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে স্বল্প বৈষম্যপূর্ণ এক মধ্য আয়ের দেশ; ২০২১ এর বাংলাদেশ হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জনকল্যাণকামী অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বির্নিমাণে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-তথ্য-প্রযুক্তিসহ দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাসে ২২টি সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। সেই সাথে ইশতেহারে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার উল্লেখ করা হয়েছিলো: (১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবেলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, (২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, (৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, (৪) দারিদ্র ঘুচাও-বৈষম্য রুখো, এবং (৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি- এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। আমাদের সমিতি মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি-চেতনা অর্থাৎ বৈষম্যহীন অর্থনীতি-সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো বিনির্মাণে বিশ্বাস করে। আর একই কারণে উল্লেখিত "রূপকল্প ২০২১"-এর চেতনা ধারণ করে। সে কারণেই আমাদের সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের বাজেট-উত্তর প্রতিক্রিয়া সে নিরিখেই বস্তুনিষ্ঠতার সাথে উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত–এ বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে আমরা ইতোমধ্যে বলেছি "বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী এবং নির্বাচনী ইশতেহারের রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণিত হয়েছে। বাজেটের দর্শন-গত ভিত্তি হিসেবে উল্লেখিত দলিলসমূহের অন্তর্নিহিত চেতনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বাজেট দলিল হবে যোগসূত্রহীন"। গত বছর বাজেট প্রকাশের আগে আমরা আরো দু'টি সুনির্দিষ্ট বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলাম: (১) গত বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হাল-অবস্থা এ বছরের বাজেটে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, এবং (২) গত বছর ছিল না অথচ "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জরুরী এমন কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা। উল্লেখ্য যে এ দু'টি বিষয়কে এবছরের বাজেটে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় এবারের বাজেটেই প্রথমবারের মত বিস্তারিত তালিকা সংযোজন পূর্বক বলা হয়েছে কোন কোন নীতি/কর্মসূচী ইতোমধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কোনগুলি বাস্তবায়নাধীন/চলমান, আর কোনগুলোর বাস্তবায়ন শুরু হয়নি (পরিশিষ্ট ক, সরণি-১,২,৩)।

গত বছর আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের সমিতির প্রাক-বাজেট প্রেস-কনফারেন্সে (২৮ মে ২০১১) আমরা বলেছিলাম "দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নে প্রয়োজন দিন বদলের সংস্কৃতি। এ রূপান্তর এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে "বদলের নির্দেশকারী" দলিল। আগামী বাজেট হতে হবে "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ণ দর্শন উদ্ভূত দলিল। ...রূপকল্প ২০২১ যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের

গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা, যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠির স্বার্থানুকূলে হতেই হবে।..উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বণ্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের"। আর এ বছর প্রাক-বাজেট বক্তব্যে আমরা বলেছিলাম "সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য-দেশে একটি অর্থনৈতিকভাবে সচল, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বাজেট একটি। সমাজ বিবর্তনের সব প্রক্রিয়ায় ঐ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ বাঞ্চণীয়"।

ভূমিকাতেই কিছু সত্য স্বীকার করা জরুরী যে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় সংশ্লিষ্টরা এবার বাজেট প্রণয়নের আগে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বক্তব্য-মতামত-সুপারিশ বেশি মনোযোগের সাথে শুনেছেন এবং এবারের বাজেটে আমাদের অনেক সুপারিশ গ্রহণও করা হয়েছে-এ জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বাজেট প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সবাইকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২০১২-১৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অর্ন্তভুক্তির জন্য আমরা কি সুপারিশ করেছিলাম

গত ০৬ই জুন, ২০১২ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর সাথে বাজেট প্রনয়ণের নীতিগত বিষয়সমূহের উপর মতবিনিময়কালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রতিনিধি দল ২০১২-১৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অর্ন্তভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করেন:

> ২০১১-১২ অর্থবছরে আশা করা হয়েছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৭ শতাংশ। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার পর্যালোচনা থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে না। কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা পূরণ হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ না হলেও ৬ শতাংশের নীচে যাতে নেমে না যায়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রবৃদ্ধি দারিদ্ররোধের অন্যতম হাতিয়ার।
>
> ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য অংগীকারকৃত ৮ শতাংশের মূল্যস্ফীতি অনেক আগেই ১০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। গত কয়েক মাস যাবৎ খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিম্নগামী। খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরতে পারলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশে নেমে না আসলেও এক অংকের ঘরে নেমে আসবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলো মূলত সংকোচনমূলক ব্যবস্থা। সংকোচনমূলক ব্যবস্থা অর্থনীতির গতি হ্রাস করতে পারে। সরকারকে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস না পায়, আবার মূল্যস্ফীতি হ্রাস করা যায়। শুধু আর্থিক নীতি দিয়ে কাজ হবে না। যথোপযুক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা ও বাজার হস্তক্ষেপও কাম্য।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের হাতে একটি হাতিয়ার হবে টিসিবির মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগপণ্য আমদানি করে তা ন্যায্যমূল্যে বিতরণ করা। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে এমনভাবে পুর্নবিন্যাস করে টিসিবিকে ব্যবহার করা উচিত। আশা করি, এদিকে নজর দেওয়া হবে। আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে বাজার তদারকি এবং সেই আঙ্গিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

গত ২/৩ বছরের ন্যায় এবারও কৃষি উৎপাদন ভালো হয়েছে এবং পাশাপাশি সরকারের ওএমএস কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে। তাই চালের দাম কিছুটা কমে এসেছে। ওএমএসসহ অন্যান্য ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, যাতে চালের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকে।

চালের বাজারমূল্য হ্রাস পেলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষক যাতে নায্যমূল্য পায়, উৎপাদন খরচ পুষিয়ে নিতে পারে, সেদিকেও সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকার যৌক্তিকমূল্যে শস্য সংগ্রহ ছাড়াও কৃষক ক্লাব গঠন, গ্রোয়ার্স মার্কেট, পাইকারী বাজার স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল। এসমস্ত কার্যক্রম কতটুকু সফল, তা আসন্ন বাজেট ঘোষণায় অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিৎ।

ঘাটতি অর্থায়ন বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচিত বিষয়। সরকার অংগীকার করেছিল, এটা ৫ শতাংশের বেশী হবে না। কিন্তু সরকারের মধ্যবর্তী বাজেট পর্যালোচনা দলিল থেকে দেখা যাচ্ছে, যে ৫৫০০ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী হ্রাস করার পরেও ঘাটতি অর্থায়ন ৫ শতাংশ অতিক্রম করবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী কমিয়ে নয়, বরং সরকারের আয় বাড়িয়ে ও অনুন্নয়নমূলক খরচ কমিয়ে বাজেট ঘাটতি কমানো উচিত।

সকল বিত্তবান/সচ্ছল ব্যক্তিকে আয়করের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্যের আলোকে জরিপ চালাতে হবে এবং তথ্য ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেককে টিআইএন দিতে হবে। কর প্রশাসনকে উপজেলা এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে।

কর আয় বাড়ানোর জন্য এনবিআর-এর মানব ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর প্রশাসনের সততা নিশ্চিত করা, কর পরিধি বৃদ্ধি, অন-লাইন কর প্রদানের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, বিলাসদ্রব্যের উপর করারোপ বা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মনে করে, কর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচ্য বিষয় হতে হবে : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র নিরসন, বৈষম্য হ্রাস, ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা

সরকারি ব্যয় কমানোর সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। এ প্রসংগে জনপ্রশাসন সংস্কার-এর অংগীকার বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। একাজটি গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নেয়া জরুরি। বাজেটে এর প্রতিফলন থাকা উচিত।

২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং সাফল্যজনক দিক হ'ল: সরকারের রাজস্ব আহরণ। মধ্যবর্তী বাজেট পর্যালোচনা দলিল থেকে দেখা যায় গত অর্থবছরের (২০১০-১১) তুলনায় বর্তমান অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ প্রবৃদ্ধি ২৫ শতাংশেরও বেশী। অধিক থেকে অধিকতর রাজস্ব আহরনের সক্ষমতা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিগত কয়েক অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের গতিধারা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রত্যক্ষ করের অবদান ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। দেশের আয় বৈষম্য নিরসনে এটা কোন ভাবেই কাম্য নয়, এধারার পরিবর্তন আনতে হবে।

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী কোম্পানী নিবন্ধনের সময় পরিচালকদের TIN থাকা আবশ্যক। কিন্তু কোম্পানীর TIN নেয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। কোম্পানীর TIN নেয়া এবং তা প্রতিবছর নির্দিষ্ট অংকের ফি প্রদানের মাধ্যমে নবায়ন করার প্রথা চালু করলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং নিবন্ধিত কোম্পানীসমূহ ব্যবসা পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত হবে না।

সকল TIN ধারীর রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন করা যেতে পারে।

মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর আয় পুজিঁ বাজারের সুদের উপর নির্ভর করে। অন্যকথায় তাদের আয় বাজার উঠা নামার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাই বর্তমানে প্রযোজ্য মার্চেন্টব্যাংকগুলোয় কর হার ৪২.৫% থেকে কমানো উচিত।

শতভাগ বাজেট বাস্তবায়ন-সরকারের এ অংগীকার বর্তমান অর্থবছর (২০১১-১২) সহ গত তিন অর্থবছরে সরকার রক্ষা করতে পারেনি। ঠিকমতো বাজেট বাস্তবায়ন করার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য

যতই ভালো হোক, বরাদ্দ যতই দেওয়া হোক বাস্তবায়িত না হলে সুফল পাওয়া যায় না। কাজেই বছরের শুরু থেকেই কার্যকর উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ চাই। সেই লক্ষ্যে কার্য্যকর কৌশল গ্রহণ/শক্তিশালী করার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

গত অর্থবছরের (২০১০-১১) প্রথম ছয় মাসের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের (২০১১-১২) প্রথম ছয় মাসের বাজেট বাস্তবায়নে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় কিছুটা গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং যদি তা বজায় থাকে, তাহলে আগামী কয়েক অর্থবছরের মধ্যেই বাজেট বাস্তবায়ন কাংখিত পর্যায়ে পৌঁছাবে।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীর গতির কারণেই বৈদিশিক ঋণ সাহায্য "ছাড়" (disbursement) কমেছে। বৈদেশিক ঋণ/অনুদানের disbursement বাড়ানোর জন্য সরকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করেছে। এগুলোই যথেষ্ঠ নয়, সাথে সাথে সরকারকে অর্থনৈতিক কুটনীতি জোরদার করতে হবে এবং **দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারনা বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**

উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উচ্চ হারে বিনিয়োগ যা নির্ভর করে অবকাঠামোগত সুবিধা ও সুশাসন-এর উপর। পরিবহনগত অবকাঠামো উন্নয়নে আমরা সফলতার মুখ দেখিনি। বৃহৎ পরিবহনগত অবকাঠামো যেমন: পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন ও অন্যান্য প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারকে কালক্ষেপণ না করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্বল্প মেয়াদী রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে মধ্যম ও বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রতি নজর দেয়া উচিৎ। তাছাড়া, এয়ার কন্ডিশন আমদানীর ক্ষেত্রে করারোপ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নিজস্ব জ্বালানি ব্যবস্থা ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

বিদেশী ঋণ ও অনুদান প্রবাহ তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ায় এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণ প্রাপ্তি কম হওয়ায় ভর্তুকির অর্থছাড়সহ অন্যান্য

ব্যয় মেটাতে সরকারকে ব্যাংক উৎস থেকে মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে। এর ফলে দুই ধরণের সমস্যা তৈরী হয়– একদিকে মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের অর্থ পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। সরকার যাতে পরিমিত পরিমাণে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেয়, সেদিকে নজর দেয়া দরকার।

ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ঘাটতি অর্থায়ন অর্থনীতির সার্বিক কল্যানে অবদান রাখে। এ লক্ষ্যে সরকারের উচিত একটি কার্যকর (active) বন্ড মার্কেট (সেকেন্ডারী মার্কেট সুবিধাসহ) তৈরী করা। এর ফলে সরকারী বন্ড কেনা-বেচায় জড়িত প্রাইমারী ডিলার (ব্যাংক)রা তারল্য সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পাবে আর অন্যদিকে আর্থিক বাজারে price discovery (সুদের হার নির্ধারণ) ও সম্ভব হবে।

টাকার অবমূল্যায়ন রোধকল্পে বৈদেশিকখাত পরিস্থিতির উন্নতি প্রয়োজন। চলতি হিসাবের ঘাটতি তথা রপ্তানী আয় বৃদ্ধি, আমদানী ব্যয় হ্রাস ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এরসাথে আর একটি বিষয়ও মনে রাখা উচিত, চলতি হিসাব বা সার্বিক ব্যালেন্স অব পেমেন্ট যখন উদ্বৃত্ত থাকে তখন সহনীয় পর্যায়ের মধ্যে টাকার পুর্নমূল্যায়ন (revalution/ appreciation) করা উচিত। এটাই বাজার নির্ভর বিনিময় হারের নিয়ম/নীতি। কিন্তু বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারের হস্তক্ষেপে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা হয়। আবার যখন ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ঘাটতি হয়, তখন বিনিময় হার অবমূল্যায়নে (devaluation/depreciation) হস্তক্ষেপ করা হয় না।

বর্তমান বছরের বাজেট বাস্তবায়নের অন্যতম দুর্বল দিক হচ্ছে সরকারের ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা। প্রাথমিকভাবে ভর্তুকির জন্য বরাদ্দ ছিল ২০,৪৭৭ কোটি টাকা। পরে তা বেড়ে দাড়ায় ৩০,১৫৪ কোটি টাকা। বিশেষত: ভাড়া ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অতিরিক্ত অর্থ ভর্তুকি প্রদানের কারণেই এ বৃদ্ধি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভর্তুকি estimation-এ ভুল ছিল।

ভর্তুকি কমানো জরুরী। কিন্তু কিভাবে? কৃষি ভর্তুকি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অক্ষুন্ন রেখেই ভর্তুকি কমাতে হবে।

আমাদের উন্নয়ন বাজেটে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি খাত। বর্তমান বাজেট কাঠামো ও বরাদ্দবিন্যাসে তা প্রতিফলিত হয়। বিনিয়োগ

বাড়ানো, ভর্তুকিসহ অবকাঠামো উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি গ্রামীণকৃষি বহির্ভূত খাতগুলোর উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। সরকারী কর্মসূচী যেমন: একটি বাড়ী-একটি খামার, কর্মসৃজন ইত্যাদির বাস্তবায়ন গতি বাড়াতে হবে।

গতবারের ন্যায় এবারও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে দেশের কৃষি-পরিবেশ জোন ভিত্তিক এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্ক রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ শষ্য-বহুমুখীকরণের দরকার। সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য "কৃষি বীমা" চালুর সরকারী অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পর আমাদের বিবেচনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে আমরা জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ ভাগ শিক্ষাখাতে ব্যয় করি। এ সরকারের অন্যতম অর্জন নূতন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হলে অর্থ-বরাদ্দ যৌক্তিকভাবে বাড়াতে হবে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্চনীয়। গ্রামীণ স্বাস্থ্য বীমা চালু করা যেতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি কর্মসূচীসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপত্তা প্রদানসহ তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করে। এ লক্ষ্যে অনেক কর্মসূচী রয়েছে-এগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করতে হবে এবং এগুলো যাতে সঠিকভাবে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আগামী অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি কর্মসূচীর আওতা বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ এমূহুর্তে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনি সুবিধা পাবার যোগ্য খানার মধ্যে মাত্র ২৫ ভাগ খানা এ সুবিধা পেয়ে থাকে।

গত দুইটি অর্থবছরের বাজেটে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাস জমি বিতরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অগ্রগতির চিত্র ব্যাখ্যাসহ আগামী বাজেটে এক্ষেত্রে অগ্রগতি তরান্বিত করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলা আছে। অন্য দিকে নিরঙ্কুশ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সুতরাং দারিদ্র নিরসন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে অধিক হারে খাস জমি বন্দোবস্ত করতে পারে। এ কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল।

জনস্বাস্থ্য গবেষকরা জানান, সরকারের উদার করনীতির জন্য বাংলাদেশে তামাক সেবীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সিগারেটের ক্ষেত্রে মোট ৪টি সম্পূরক

কর স্ল্যাব আছে। এ স্ল্যাবসমূহের কর উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো উচিত। এর ফলে সরকারি রাজস্ব বাড়বে এবং অন্যদিকে সিগারেট সেবীর সংখ্যাও কমে যাবে।

ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ একটি নীরব ঘাতক এবং বড় স্বাস্থ্য বিপর্যয়মূলক ইস্যু। কিন্তু সে তুলনায় আর্সেনিকমুক্ত সুপেয় পানি সরবরাহের কর্মসূচি যথেষ্ঠ গুরুত্ব পায়নি। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাসমূহে **সনোফিল্টারের** সহজলভ্যতাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

পরিবেশবান্ধব বাজেট বাস্তবায়নের জন্য শুধু অর্থমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও আর্থিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ন ও সঠিক বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কার্যকলাপ প্রতিরোধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

আমরা দেখছি বছরের শুরুতে বাজেটে নারীর জন্য প্রকল্পের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু আমাদের জানা হয়না বাস্তবে এর কতখানি কার্যকর হয়েছে। এটি পরিবীক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই পরিবীক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া যায় একটি জাতীয় পর্যায়ের মনিটরিং সেলকে যেখানে থাকবেন জেন্ডার বাজেট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতিনিধি, সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি।

নারী কৃষিতে কাজ করছে বহু শতাব্দি ধরে কিন্তু নারীর নামে জমি না থাকায় নারী ভাসমান এবং ঠিকানা বিহীন। নারী কৃষক নয় অতএব নারী কৃষি কার্ড পায়না। কৃষি ঋণ পায় না। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের সুবিধা পায় না। ফসল সংরক্ষণের সুব্যবস্থা (কোল্ড স্টোরেজ) পায়না। এই কৃষিজীবী নারীর কৃষক স্বীকৃতি প্রয়োজন। তাহলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে।

গ্রামে অথবা শহরে নারীর জীবন যন্ত্রনাময় বাল্য বিয়ে, যৌন হয়রানি, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতন এসবই নারী এককভাবে সহ্য করে। এসব প্রতিরোধে আমাদের নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বাজেটে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকলে স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট তৈরীর সময় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকার বিষয়টি অনেক বেশী গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতো।

নারীর সাংসারিক কাজের ফলে যে মূল্য সংযোজন হয়, তার অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দানের উদ্যোগটি সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। টেকসই অর্থনীতির স্বার্থে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এ কাজে অগ্রসর হয়েছে। নারীর অস্বীকৃত কাজের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নারীকে সমাজে সম্মানিত করবে এবং ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতনের মত কঠিন সমস্যাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃত হবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম প্রণেতা ও লেখকদের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। এ শিক্ষার কর্মসংস্থান নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করার কথা সবসময় বলা হয়েছে। এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

আমাদের প্রস্তাব ও সরকারের বাজেট ঘোষণার মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী নয়। অকপটে সরকারি ব্যর্থতা স্বীকার করা, রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধির হার, এডিপির বাস্তবায়ন হার বাড়ানোর পদক্ষেপ, ঘাটতি অর্থায়ন হ্রাস করা তথা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ কমিয়ে আনা, সম্প্রসারনশীল বাজেট আকার, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্পর্কিত প্রস্তাবনাসমূহ আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তার অর্থ এই নয় যে, বাজেটের কোন দুর্বলতা বা downside ঝুঁকি নেই। চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়নে সেগুলো অবশ্যই বিবেচনায় এনে কার্যকর আরও কিছু পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করে বাজেটকে এর স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাজেটের অনুমান ভিত্তি

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তঃস্থ কয়েকটি অনুমানকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। ভিত্তিগুলো নিম্নরূপ: সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকবে; রাজস্ব ও মুদ্রানীতি কৌশলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে; ২০১৩ সালে মন্দা থেকে ইউরোপসহ বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাড়াবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে; বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর সাথে ইসিএফ কর্মসূচি কার্যকর হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগীসহ অন্যান্য সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে আস্থা বাড়বে ফলে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে এবং পাইপ লাইনে থাকা বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্তি সহজতর হবে–যা প্রকল্প সহায়তার ব্যবহার বাড়াবে এবং এডিপি বাস্তবায়ন গতি বাড়াবে; সঞ্চয়পত্রের সুদের হার বৃদ্ধি এবং ডায়াসপোরা বন্ড ছাড়ার ফলে ব্যক্তিখাতে ঋণ ও বিনিয়োগ প্রবাহ হ্রাসের সম্ভাবনা থাকবে না; রাজস্ব ও মুদ্রাখাতে পরিসর সৃষ্টি হবে; ত্বরান্বিত হবে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ; কৃষি খাতের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে; রপ্তানি বাণিজ্যে অবস্থান সুদৃঢ় হবে; অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার সক্ষমতা থাকবে; আগামী অর্থবছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার হবে ৭.২ শতাংশ; রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে;

PPPসহ বিভিন্নভাবে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বাড়বে; কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়বে; বিদ্যুৎ-জ্বালানি-যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নতি হবে; মেয়াদি শিল্প ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে; ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশ পৌঁছবে; রাজস্ব আহরণ জিডিপির ১৩.৪ শতাংশে উন্নিত হবে; একইভাবে মোট ব্যয় দাড়াবে জিডিপি-র ১৮.১ শতাংশ তার মধ্যে এডিপি-র বরাদ্দ হবে জিডিপি-র ৫.১ শতাংশ; বাজেট ঘাটতি হবে জিডিপি-র ৫ শতাংশের সমপরিমান; মূল্যস্ফীতি আগামী অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে উপনিত হবে (এবং ক্রমান্বয়ে মধ্যমেয়াদে তা কমে ৫ শতাংশে দাঁড়াবে); বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা হবে; অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেক গুরুর মতে প্রক্ষেপনের অনুমান ভিত্তি অনেক সময় কাজ করে না। যে কারণে বলা হয় "অর্থনীতিবিদদের কাজ হলো গত কাল অনুমানের ভিত্তিতে যে প্রক্ষেপন করা হয়েছিলো তা কেন আজ কাজ করলো না সে বিষয়ে ভবিষ্যতে বিচার-বিশ্লেষণ করা"-এসব কথা সত্য হতে পারে যখন প্রক্ষেপণের অনুমান ভিত্তি হয় বাস্তবতা বিবর্জিত। বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ও দুর্বল দিকসমূহসহ অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ বিভিন্ন সমীকরণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব যে সঞ্চয় হার যখন ক্রমবর্দ্ধমান (এমন কি বিনিয়োগ হারের চেয়ে বেশি), যখন বিনিয়োগ স্থবিরতা দূর হবার লক্ষণসমূহ স্পষ্ট, যখন রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্দ্ধমান, যখন রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়ার লক্ষণ স্পষ্ট, যখন কৃষির গতি বাড়ছে, যখন মেয়াদি শিল্প ঋণ বাড়ছে, যখন মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, যখন বিনিয়োগে সম্ভাব্য "ভীতি ফ্যাক্টর" কমছে এবং সেইসাথে যখন বাড়ছে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও সুরক্ষার উপাদান–এ অবস্থায় বাজেটের অনুমান ভিত্তিসমূহ আমাদের মতে কাঙ্খিত মাত্রায় যুক্তিসংগত এবং বাস্তবসম্মত।

বাজেটের আয় ও ব্যয় – আমাদের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

এ বছর বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৮.১%) যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৮.৯ শতাংশ বেশি। যেখানে অনুন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট খাতের মোট বরাদ্দ ১লক্ষ ৩৬ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১৩.১%) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ ৫৫ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি-র ৫.২৮%)। বাজেটের আকারের সাধারণ গতিধারা এবং মূল্যস্ফীতির নিরিখে প্রস্তাবিত বাজেটের আকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ যেমন একদিকে বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হবে তেমনি অনুন্নয়ন খাতের ১৫ শতাংশ আসলে দারিদ্র দূরীকরণ উদ্দিষ্ট উন্নয়ন ব্যয় (প্রধানত অতি দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কর্মসূচীর ব্যয়)। এ

বছর বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক, কারণ নূতন বেতন কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে, সুদ পরিশোধ ব্যয় বাড়বে, কৃষি ভতুর্কিসহ ভাড়া ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভতুর্কি দিতে হবে, সঞ্চয়পত্র বিক্রি বাড়ার কারণে বর্দ্ধিত সুদ পরিশোধ করতে হবে।

এ বছর বাজেটে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৪১%)। এ আয়ের ১লক্ষ ১৬ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.১২%) আসবে কর-রাজস্ব হিসেবে (এনবিআর কর রাজস্ব ১১২,২৫৯ কোটি টাকা), আর কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আয় হবে ২২ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.১৯%)। অর্থাৎ রাজস্ব আয়ের ৮৩.৬ শতাংশ আসবে কর রাজস্ব থেকে।

আমাদের বাজেট–একটি ঘাটতি বাজেট, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। মোট প্রাক্কলিত ঘাটতির পরিমাণ ৫২ হাজার ৬৮ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৫%)। লক্ষ্যণীয় যে আমাদের বাজেট ঘাটতির পরিমাণটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দের প্রায় সমান। ঘাটতি পূরণে সহজ শর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক ঋণ থেকে আহরণ করা হবে ১৮ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১.৮%) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৩৩ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৩.২%)। অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি পূরণে ৬৪.৩ শতাংশ নির্ভর করতে হবে অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া হবে ২৩ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি-র ২.২%) এবং ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নেয়া হবে ১০ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা (জিডিপি-র ১% যার বেশির ভাগ আসবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে)। এ ক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো ঘাটতি বাজেটের সাথে মূল্যস্ফীতি তেমন সম্পর্কিত নাও হতে পারে যদি ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে উৎপাদনশীল খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। এ দিকে নজর রাখতে হবে। অন্যদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকা নিলে যার মধ্যে আবার ১৮ হাজার ৪০০ কোটি (অর্থাৎ ৮০%) দীর্ঘমেয়াদের–সেক্ষেত্রে ব্যাংকের তারল্য চাপ বাড়তে পারে, যা নিঃসন্দেহে সুদের হার বাড়াবে; এবং ফলশ্রুতিতে প্রবৃদ্ধির প্রধান সহায়ক খাত শিল্প খাতের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, আর সেই সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ প্রবৃদ্ধির গতি হ্রাস পেতে পারে।

বাজেট জনকল্যাণকামী এবং ভারসাম্যপূর্ণ কি'না-এ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা মোট বাজেটের (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) এবং সে সাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) বরাদ্দ বিন্যাস সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। আগেই বলেছি বাজেটকে হতে হবে উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দলিল।

প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ প্রদানে এবারে ৩টি মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে: (১) আঞ্চলিক সমতা, (২) উন্নত অবকাঠামো, এবং (৩) গুণতহ ব্যয়। এসব মানদণ্ড যথেষ্ঠ যৌক্তিক। দ্বিতীয়: এবারই বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেশজ মোট উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রাক্কলিত আকার ১০ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। তৃতীয়ত: বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন দলিত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বরাদ্দ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ, বিদ্যুতখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, বেসরকারী ইপিজেড-এর কর অবকাশ ইত্যাদি। চতুর্থত: অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ উন্নয়ন বাজেটের চেয়ে ২.৪ গুণ বেশী যে প্রবণতা সুখকর নাও হতে পারে।

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন নিয়ে যে মোট বাজেট তার ব্যয়-বরাদ্দ কাঠামো সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিম্নরূপ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট বরাদ্দে অগ্রাধিকারক্রম অথবা প্রাধান্যক্রম নিম্নরূপ: সর্ব্বোচ রবাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **ভৌত অবকাঠামো** যার অন্তর্ভুক্ত হলো সার্বিক কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, বৃহত্তর যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি–এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ২৭.৮ শতাংশ; দ্বিতীয় সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **সামাজিক অবকাঠামো** যার অন্তভুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট-এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ২৪.২ শতাংশ; তৃতীয় সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **সাধারণ সেবাখাত**-এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ১৯.৩ শতাংশ; চতুর্থ সর্ব্বোচ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত হলো **সুদ পরিশোধ**-এ খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ১২.২ শতাংশ; সবশেষ পঞ্চম স্থানে আছে **নীট ঋণদান ও অন্যান্য** ব্যয়- মোট বরাদ্দের ১১.৭ শতাংশ। আমাদের মতে মোট বরাদ্দের এ অগ্রাধিকারক্রম অযৌক্তিক নয়। তবে 'সুদ পরিশোধ' খাতে ব্যয়-বরাদ্দ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বরাদ্দের দ্বিগুণেরও বেশী-বিষয়টি যথেষ্ট চিন্তা উদ্রেগকারী এবং সম্ভবত অতীতের পুঞ্জিভূত ভারসাম্যহীনতার ফল।

মোট বাজেট ব্যয়-বরাদ্দের খাত ভিত্তিক অগ্রাধিকারক্রম বা প্রাধান্যক্রম অন্যভাবে আরো একটু বিস্তারিত দেখা যেতে পারে। এ বিশ্লেষণ বরাদ্দক্রম নিম্নরূপ : সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত খাত, জনপ্রশাসন (মোট বরাদ্দের ১২.৬%); এর পরে আছে যথাক্রমে সুদ (১২.২%), শিক্ষা ও প্রযুক্তি (১১%), ভর্তুকি (৭.৫%), স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন (৭.৪%), পরিবহন ও যোগাযোগ (৬.৮%), প্রতিরক্ষা (৬%), সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (৫.৩%) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ (৫%), **স্বাস্থ্য (৪.৭%), কৃষি (৪.৩%)**, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা (৪.২%), পেনশন (২.৩%), শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস (১.৫%), বিনোদন, সংস্কৃতি, ধর্ম (০.৮%) গৃহায়ণ (০.৭%) এবং বিবিধ (৬.৩%)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে মোট বাজেটে **অন্যান্য খাতের** তুলনায় **স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে** বরাদ্দ **অনেক পিছিয়ে**। এ **অবস্থা কাম্য অবস্থা** নয়।

চ) দারিদ্র দূর/হ্রাস

ছ) মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি

জ) নারী বান্ধব উন্নয়ন

ঝ) প্রান্তিক-জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ইত্যাদি।

বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মত এবং মানসম্মত বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন কার্যকারীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেটে ঘোষিত পদক্ষেপসমূহের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি। সংশ্লিষ্ট আন্তমন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয় জোরদার এবং পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড শক্তিশালী করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ করা জরুরী।

বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি এখনকার ডাবল ডিজিট থেকে ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা-এক বাস্তবায়নযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে চুড়ান্ত বাজেটে একটি বিশ্লেষণ থাকা জরুরী বলে আমরা মনে করি। আর তা হলো এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য হ্রাসমান। সুতরাং এ দিক থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে পারে। আর অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয় বা সাযুজ্যপূর্ণ করতে হবে (আইএমএফ-এর শর্ত অনুযায়ী) এবং টাকার বিনিময় হার পতন হতেও পারে–সুতরাং খাদ্য-মূল্যস্ফীতি নাও কমতে পারে আর খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি আপাততঃ কমবে না। শুধু অর্থের প্রবাহ টেনে ধরে মূল্যস্ফীতি কমবে না। ভিন্ন পথে ভাবতে হবে-যে পথে শিল্পায়ন ত্বারাম্বিত হবে, যে পথে অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং একই সাথে কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাবেন, যে পথে বৈষম্য-হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

এবারের বাজেটে সামনের অর্থবছরের জন্য মোট দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.২ শতাংশ (মূল্যস্ফীতি যেখানে ৭.৫%)। এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, যদি নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণে সমন্বিত পদক্ষেপসহ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা বাড়ানো যায়–

ক) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ইসিএফ (Extended credit facility) কার্যকর করে উন্নয়ন সহযোগিদের আস্থা বৃদ্ধি; যা বিনিয়োগ সহায়ক হবে

খ) পাইপ লাইনে থাকা বৈদেশিক অনুদান-ঋণের অবমুক্তি সহজতর করা

গ) প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানো

চ) দারিদ্র দূর/হ্রাস

ছ) মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি

জ) নারী বান্ধব উন্নয়ন

ঝ) প্রান্তিক-জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ইত্যাদি।

বাজেটের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ও দুর্বল দিক হলো সময়মত এবং মানসম্মত বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন কার্যকারীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেটে ঘোষিত পদক্ষেপসমূহের পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি। সংশ্লিষ্ট আন্তমন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয় জোরদার এবং পরিবীক্ষণ-মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড শক্তিশালী করার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ করা জরুরী।

বার্ষিক প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি এখনকার ডাবল ডিজিট থেকে ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা-এক বাস্তবায়নযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে চুড়ান্ত বাজেটে একটি বিশ্লেষণ থাকা জরুরী বলে আমরা মনে করি। আর তা হলো এ বছর ধানের ফলন ভাল হয়েছে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য হ্রাসমান। সুতরাং এ দিক থেকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমতে পারে। আর অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য আর্ন্তজাতিক বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয় বা সাযুজ্যপূর্ণ করতে হবে (আইএমএফ-এর শর্ত অনুযায়ী) এবং টাকার বিনিময় হার পতন হতেও পারে–সুতরাং খাদ্য-মূল্যস্ফীতি নাও কমতে পারে আর খাদ্য-বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি আপাততঃ কমবে না। শুধু অর্থের প্রবাহ টেনে ধরে মূল্যস্ফীতি কমবে না। ভিন্ন পথে ভাবতে হবে-যে পথে শিল্পায়ন ত্বারাম্বিত হবে, যে পথে অনেক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং একই সাথে কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাবেন, যে পথে বৈষম্য-হ্রাসকারী প্রবৃদ্ধি-উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।

এবারের বাজেটে সামনের অর্থবছরের জন্য মোট দেশজ উৎপাদনের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭.২ শতাংশ (মূল্যস্ফীতি যেখানে ৭.৫%)। এ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, যদি নিম্নবর্নিত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণে সমন্বিত পদক্ষেপসহ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা বাড়ানো যায়–

ক) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ইসিএফ (Extended credit facility) কার্যকর করে উন্নয়ন সহযোগিদের আস্থা বৃদ্ধি; যা বিনিয়োগ সহায়ক হবে

খ) পাইপ লাইনে থাকা বৈদেশিক অনুদান-ঋণের অবমুক্তি সহজতর করা

গ) প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়ানো

ঘ) এডিপি বাস্তবায়ন গতিশীল করা

ঙ) প্রবাসিদের প্রেরিত অর্থ (যার পরিমান ১২ বিলিয়ন ডলার নয় আসলে ২৪ বিলিয়ন ডলার)-এর উৎপাদনশীল ব্যবহার বিনিয়োগে জাতীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা

চ) সঞ্চয় পত্রের সুদের হার বৃদ্ধি (ফলে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ বাড়বে)

ছ) ডায়াসপোরা বন্ড বাজারে আনা

জ) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অধিকহারে ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রদান (শিল্পে প্রাধান্য দিয়ে)

ঝ) ঘাটতি বাজেটের অর্থ সংস্থানে ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কমানো

ঞ) রপ্তানী-আমদানী প্রণোদনায় নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জোর দেয়া

ট) সুদের হার সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ

ঠ) সংযত মুদ্রানীতি ও সুসংহত রাজস্ব খাতের সমন্বয়

ড) 'বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি'-র মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

ঢ) রেটসমূহ পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে এনবিআর-বহির্ভূত ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

ণ) আয় করের পরিসর বৃদ্ধি; উচ্চ আয়কর দেবার যোগ্য অথচ দেন না-বিষয়টি খতিয়ে দেখা

ত) ভূমি সংস্কার কর্মকাণ্ডে হাত দেয়া

থ) নারী উদ্যোক্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে সরকারকে অবশ্যই প্রচন্ড বেগ পেতে হবে। বাজেট ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। অনুন্নয়ন মূলক খরচ কমানো, বিশেষ করে জনপ্রশাসনের ব্যয় কমানো, অপচয় কমানো ইত্যাদি সম্পর্কে বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। এসব বিষয় চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা উচিত।

ব্যাংক-ব্যবস্থা থেকে বিপুল ঘাটতি অর্থায়ন এবং বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার সংকটকালে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সরকারের নিকট আরও একটি বড় বাঁধা। শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ও টিসিবি শক্তিশালী করার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধ করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত রাজস্ব ব্যবস্থা, বাজার তদারকী ও বাজার হস্তক্ষেপ-বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে স্পষ্ট করা উচিত।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির অন্যতম পথ অবকাঠামোগত সুবিধা available করাসহ "cost of doing business" কমিয়ে আনা। এ বিষয়ে চুড়ান্ত বাজেটে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ নির্দেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বসহ বিবেচনার ক্ষেত্রসমূহ হলো: আইন শৃংখলা উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাসে "ক্ষতি হ্রাস কৌশল", বিদ্যুৎ-জ্বালানির সহজলভ্যতাসহ বিভিন্ন অবকাঠামো সুবিধে সৃষ্টি, ব্যাংক-বীমা-কাস্টমসহ দলিল-দস্তাবেজ সহজীকরণ, ব্যবসা-দ্রুতায়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ ইত্যাদি।

পুজিঁবাজার সংস্কার ও পুজিঁবাজারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা বর্তমান সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ মূহূর্তে পুজিঁবাজারের সমস্যা শুধু সরবরাহ ঘাটতি নয়। চাহিদা স্বল্পতাই বরং প্রকট আকার ধারণ করেছে। পুজিঁবাজার ও অর্থবাজারের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। তবে, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে সরকারী ও কর্পোরেট বন্ড মার্কেট সৃষ্টি করা উচিৎ। এর ফলে একদিকে stock market এর উপর নির্ভরশীলতা কমবে অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা তাদের পোর্টফোলিও বৈচিত্রকরণে সক্ষম হবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে Mutual Fund এর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন। বিষয়সমূহ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ জরুরী।

বাংলাদেশের অর্থিক ব্যবস্থা মূলত: ব্যাংক নির্ভর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিকিউরিটিজ মার্কেট-এর সীমিত ভূমিকাও বর্তমান অবস্থায় তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি "ব্যক্তি খাত"-এর অর্থায়ন যাতে কোন অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন না হয়, তার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংককে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর মুদ্রানীতি ও ঋণনীতি হতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব। **অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ রোধকল্পে** বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

বাজেটে সকল রপ্তানীকারকদের রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার ০.৬-০.৭% এর পরিবর্তে ১.২% এ নির্দ্ধারণ-এর প্রস্তাব করা হয়েছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে আয়কর সংগ্রহ হারের এ উন্নয়ন রপ্তানি অনুৎসাহিত করবে অথবা রপ্তানিকারকদের অসৎ পন্থা অবলম্বনে বাধ্য করতে পারে। বিষয়টি বাণিজ্যের ভারসাম্যের সাথেও জড়িত। আমরা মনে করি রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার প্রস্তাবিত ১% এর পরির্বতে পূর্বের কর হার অব্যাহত রাখা যৌক্তিক হবে।

বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে "কৃষি ও কৃষক মহাজোট সরকারের উন্নয়ন ভাবনার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ"। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা জরুরী যেন কৃষি ভর্তুকি না হ্রাস

পায় এবং ভর্তুকি-বৈষম্য যেন হ্রাস পায়। সেই সাথে আমরা এও মনে করি যে কৃষি ও কৃষক ভাবনার যর্থাথতা বিচারে ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার একর কৃষি জমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব; আর পাশাপাশি ২০ হাজার জলাহীন মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার একর খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব। বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দেয়া সমিচিন হবে।

যদিও নির্বাচনী ইশতেহারে 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো-বাজেটে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। আমরা মনে করি চুড়ান্ত বাজেটে বিষয়টি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ স্থির করা প্রয়োজন।

আমরা মনে করি দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের আবাসনের বরাদ্দ পৃথক দেখানো এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

এদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সুবিধা পাবার যোগ্য খানার সংখ্যা ২ কোটি যাদের ৭৫ শতাংশ এ সুবিধে বঞ্চিত। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এ খাতটি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সামগ্রিক বিচারে এ খাতে ব্যয় বরাদ্দ এবং পরিধি (coverage) তুলনামূলক হ্রাস পেয়েছে। আমরা মনে করি জনকল্যাণ নিশ্চিত ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত বাজেটে এ খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা জরুরী। সেইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সুবিধা প্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (যেমন বয়স্কভাতা যারা পান তারা দুরবর্তী গ্রাম থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে এসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন)।

ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য "শস্য বীমা" "কৃষি বীমা", "জীবিকা বীমা", "প্রাকৃতিক দুর্যোগ বীমা" "স্বাস্থ্য বীমা" ইত্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পথ নির্দেশসহ ব্যয়-বরাদ্দ চুড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

দারিদ্র-পীড়িত ভৌগলিক এলাকা (চর-হাওর-বাওর-মঙ্গা)এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ (আইলা-সিডর-সাইক্লোন) এলাকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ উপকরণ ক্রয়ে সুদবিহীন স্বল্পমেয়াদি (৬মাস) ঋণ প্রদান দারিদ্র দূরীকরণে অন্যতম পন্থা হিসেবে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বিষয়টি এবারের চুড়ান্ত বাজেটে বিবেচিত হতে পারে; সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এবারের বাজেটে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আর্থিক বরাদ্দের উল্লেখ নেই। আমরা মনে করি চুড়ান্ত বাজেটে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা জরুরী।

নূতন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ চূড়ান্ত বাজেটে উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত। সেইসাথে শিক্ষার স্তর ভেদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, বিশেষায়িত, ভোকেশনাল ইত্যাদি এবং মূলধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ ভিন্ন দেখানো উচিত।

জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়ন জাতীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বিগত দুই অর্থবছরসহ বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে পরিবেশকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়নি। নদীর দখল-দূষণ প্রতিকারে "জাতীয় নদী কমিশন" গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা উচিৎ। পরিবেশ বান্ধব বাজেটের জন্য প্রয়োজন প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্টির পরিবেশ বিরোধী অন্যায় কর্মকান্ড প্রতিরোধে রাজনৈতিক অংঙ্গীকার। বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী।

নিম্ন আয়ের মানুষের কথা বিবেচনায় এনে আয়কর রহিত সীমা ১,৮০,০০০/- টাকা হতে ২,০০,০০০/- টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো।

ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট (এফডিআর) এর উপর টিআইএন ধারীদের ক্ষেত্রে ১০% এবং টিআইএন বহির্ভুত জমাকারীদের ক্ষেত্রে ১৫% করারোপ নিম্ন আয়ের মানুষের উপর বোঝা স্বরূপ। এটা প্রত্যাহার করা উচিত।

সকল TIN ধারীর (ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী) রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে TIN নবায়ন করা যেতে পারে।

এ দেশে মাত্র ৪৬ ব্যক্তি বছরে ১ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করেন। আমাদের হিসেবে বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা ব্যক্তিগত আয়কর দেবার যোগ্য মানুষের সংখ্যা এদেশে কমপক্ষে ৫০,০০০ জন। অর্থাৎ এদের কাছ থেকেই ব্যক্তিগত আয়কর হিসেবে বছরে কমপক্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব। আর এ অর্থ ব্যয় হতে হবে 'রূপকল্প ২০২১'-এর নিরিখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য নিরসণ-উদ্দিষ্ট খাতসমুহে। আশা করি বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

দেশে এখন TIN ধারী মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখ, যাদের মধ্যে আনুমানিক ১০ লাখ মানুষ কর দেন (তাদের মধ্যে ৬-৭ লাখ সরকারি চাকুরে)। এ দেশে TIN ধারী মানুষের সম্ভাব্য সংখ্যা হওয়া উচিত কমপক্ষে ৫০ লাখ, যাদের ৫০ শতাংশ নিতম কর দেবার যোগ্য। বিষয়টি ভাবতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর আদায়ে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা আশা করি বিষয়টি চূড়ান্ত বাজেটে স্থান পাবে।

কালো টাকা অথবা মার্জিত ভাষায় অপ্রদর্শিত আয়-বাজেটে এ বিষয়ে কিছু কথা আছে। আমাদের মতে এ দেশে পুঞ্জিভূত কালো টাকার আনুমানিক পরিমান হবে ৬ লাখ থেকে ৭ লাখ কোটি টাকা (অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন জিডিপি-র ৪২-৮২ শতাংশ)। বিষয়টি বাস্তব সত্য। এ অর্থ উদ্ধার প্রয়োজন। একদিকে এমন কোন পথ-পদ্ধতি অবলম্বণ করা উচিত হবে না যার ফলে সৎ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অসৎ হতে প্রণোদিত প্রলুব্ধ হতে পারেন। নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে কালো টাকা সংশ্লিষ্ট "সিজর ইফেক্ট" কিভাবে সমাধান করা যায় বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে থাকা জরুরি। এ ক্ষেত্রে খাত হিসেবে অবকাঠামো খাতের রাস্তাঘাট-ব্রিজ-বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ শিল্প খাতের কথা ভাবা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার একদিকে যেমন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেন, অন্যদিকে একটি কমিশন গঠন করতে পারেন।

সুপেয় পানি (খাওয়ার) ও স্যানিটেশন (স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনসহ) উপখাতে বরাদ্দ এ বছর গত অর্থবছরের তুলনায় ১০৫০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতিয় লক্ষ্যমাত্রাসহ সংস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ খাতের বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বাড়াতে হবে।

গবেষণায় প্রমাণিত যে তামাকজাত পণ্যের উপর আরো অধিকহারে শুল্ক কর আরোপকরে মূল্য বৃদ্ধি করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস সম্ভব, সম্ভব সংশ্লিষ্ট অকালমৃত্যুসহ অসুস্থতা হ্রাস এবং একই সাথে এ খাত থেকে অতিরিক্ত ২ হাজার কোটি টাকার উর্দ্ধে রাজস্ব আহরণ। সেই সাথে বাড়তি এ রাজস্ব আয় সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে বিচেচনার জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

মোবাইল ফোনে "কথা বলার জন্য কর" আরোপের যুক্তি নেই। আমরা আশা করি বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এবং মানুষে-মানুষে সৌহার্দ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর প্রত্যাহর করা হবে।

ব্যাপক মাত্রায় গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ব্যয় ছাড়া প্রকৃতি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে আমাদের নিদিষ্ট সুপারিশ যে R&D খাতে বিশেষত কৃষি সংশ্লিষ্ট উপখাতে পৃথক বরাদ্দ দেয়া উচিত; এ বরাদ্দ হওয়া উচিত কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা।

সময় এসেছে দেশে ভর্তুকি বৈষম্য নিরসনের। দেখা দরকার দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ যেন অপেক্ষাকৃত ধনীদের তুলনায় আনুপাতিক বেশী ভর্তুকি পান। বিষয়টি চুড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

বিদ্যুৎ খাতের হিসেবপত্তর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে স্থাপিত ক্ষমতা'র (installed capacity) পাশাপাশি প্রকৃত উৎপাদন চিত্র দেয়া উচিত। আমরা আশা করবো চূড়ান্ত বাজেটেএ হিসেব দেয়া হবে।

বাজেট বক্তৃতায় তথ্যগত ভ্রান্তি থাকা ঠিক হবে না; আর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনায় তথ্যে ভূল থাকা আরো বেঠিক। বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে "বতর্মানে ৯১ শতাংশ পরিবার স্যানিটেশন কভারেজের আওতায় এসেছে যা সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ" (পয়েন্ট ১০০, পৃঃ ৪০)। এ তথ্য সঠিক নয়। সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকার স্যানিটেশন কভারেজ ৯১ শতাংশের অনেক বেশী। সেই সাথে আমাদের স্যানিটেশন কভারেজ ৯১ শতাংশ কি'না তা তলিয়ে দেখা জরুরী, কারণ এ তথ্য সঠিক হলে বাংলাদেশে স্যানিটেশনের জন্য আর বরাদ্দ না করলেও চলবে।

আমাদের শেষ কথা

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় নাগাদ ২০২১ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণ-এর স্বপ্ন দেখছি। এ নির্মাণের কারিগর হবেন এ দেশেরই আপামর মানুষ যা এবছরের বাজেটে শেষ পয়েন্ট (৩০৫)-এ অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন "এ দেশের জনগণই আমাদের অমূল্য সম্পদ" আর এ কর্মযজ্ঞে নেতৃত্ব দেবেন রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালকেরা। এ বিনির্মান এক বাজেটের বিষয় নয়– কিন্তু বাজেট নিঃসন্দেহে এ বিনির্মাণের পথ-কৌশল। এ নিরিখে এ বছরের বাজেটে বেশ কিছু সাহসী, স্বচ্ছ, লক্ষ্য নির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ রয়েছে। একারণেই এ বছরের বাজেট আশা সঞ্চারণকারী দলিল। এবারের বাজেট অনেক দূর পর্যন্ত "দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন উদ্ভূত" দলিল। ভবিষ্যতে এ দলিলের "দেশজ" মাত্রা বাড়াতে হবে। 'রূপকল্প ২০২১' যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মনের গভীরে বিশ্বাস থাকতে হবে যে রাজস্ব, কর, সরকারী ব্যয়, আর্থিক নীতিমালা যা-ই বলা হোক না কেন তা দেশের বৃহত্তর দরিদ্র-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে হতেই হবে। অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি হতে হবে **প্রবৃদ্ধির সাথে বন্টন ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের, দ্রুত ভিত্তিতে বৈষম্য হ্রাসকরণের, ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের, মানব সম্পদ দ্রুত বিকশিতকরণের, শিল্পায়ন ত্বরান্বয়নের, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থান বিকশিতকরণের, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ-সর্বোত্তম ব্যবহারকরণের, নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের, এবং সর্বোপরি সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের**। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এ বিশ্বাস অলীক নয়। এ বিশ্বাস অর্থনৈতিক, নৈতিক, মানবিক যে কোনো মানদণ্ডেই যুক্তিযুক্ত। কারণ এসবই ছিল আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল ভিত্তি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

কার্যনির্বাহক কমিটি ২০১০-২০১১

সভাপতি :	ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি :	ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
	অধ্যাপক হান্নানা বেগম
	ড. জামালউদ্দিন আহমেদ
	ড. মো: মোয়াজ্জেম হোসেন খান
	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক :	ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
কোষাধ্যক্ষ :	মসিহ্ মালিক চৌধুরী, এফসিএ
যুগ্ম-সম্পাদক :	এ. জেড. এম. সালেহ্
	ড. সেলিম রায়হান
সহ-সম্পাদক :	মনজু আরা বেগম
	শামীমা আখতার
	বদরুল মুনির
	মাহতাব আলী রাশেদী
	মো: মোজাম্মেল হক
সদস্য :	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
	এম. এ. সাত্তার ভূঁইয়া
	মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার
	মো: সাদিকুর রহমান ভূইয়া
	মো: মোস্তাফিজুর রহমান সরদার
	সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি
	মো: মঈন উদ্দিন
	ড. মোহাম্মদ মামুন
	ড. মো: আলী আশরাফ
	মো: লিয়াকত হোসেন মোড়ল
	ড. যাদব চন্দ্র সাহা
	মীর হাসান মোহাঃ জাহিদ
	ড. মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
	খোরশেদুল আলম কাদেরী

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

ফোন ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬

E-mail: bea.dhaka@gmail.com, Web: www.bdeconassoc.org

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association
4/C Eskaton Garden Road, Dhaka 1000
Phone & Fax : 880 -2 - 9345996
Email : bea.dhaka@gmail.com, Web : bdeconassoc.org